উড়ান

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

ঘাম শহরের রথ

ঝড় দিচ্ছিল। প্রচণ্ড ঝড়। সে ঝড়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছিল নেড়ার পক্ষে। নেড়ার ভেতরে বাইরের এই ঝড় দেখার লোক ছিল কিনা নেড়াও জানে না কিন্তু ভয়ঙ্কর ঝড়ের মুখোমুখি নেড়া বিপন্নতার মাঝখানেও সাহস হারাল না। ভয়ে ভড়কে গেল না। তার বুকের ভেতর কে যেন বললে 'ভড়কাও মত। ডরো নেহি।'

ছিপছিপে বেতের মত চেহারা নেড়ার। কাঁচা হলুদটা সেদ্ধ করে যেন কে তার গায়ে লাগিয়ে দিয়েছে। বত্রিশের বেশী বয়েস তার। এই দীর্ঘ জীবনে অনেক টালের মুখে দাঁড়িয়েছে নেড়া। সেই শিশুকালে তার বাবা-মা একসাথে চলে যাবার পর পথ-কুকুরের মতো একা হয়ে গিয়েছিল নেড়া। অন্যান্য নাবালক ভাইদের ছেড়ে কলকাতার এক দুর্দশাময় জীবনে মরতে মরতেও তার মরা হয়নি। ঘাম শহর যদিও তার গাঁয়ের শহর তা সত্বেও কলকাতাতেই যেতে হয়েছিল সেদিন। সেখানে সেয়ানা লোকের পাল্লায় পড়ে চাকর বাকরের মুখঝামটা শোনবার পরও ট্যাকসি চালানো শিখে ট্যাক্সি ড্রাইভার হয়েছিল। সোনাগাছির ভীড়ের মাঝখানে গাড়ী থামিয়ে রাত্রিযাপন করতে হতো তাকে। সেদিনও সে নষ্ট হয়ে যায়নি। নষ্ট হওয়া কাকে বলে সে জানত না। সেখানেও নেড়া নানা পেশায় নিযুক্ত নারী-পুরুষের সঙ্গে ভাই দাদার সম্পর্ক ছিল তার। গলায় পৈতে ছিল না তবুও তাকে 'ঠাকুরদা' বলে ডাকত। সেই ট্যাকসির ভেতর ঘুমিয়ে পড়লে সোনাগাছির মেয়েরা অনেক ঝম্‌ঝম্ রাতে তাকে ডেকে খাইয়ে যেতো। নেড়ার সঙ্গে তাদের প্রাণের বন্ধুত্ব হয়েছিল যেন। এরকম তো হামেশাই ঘটতো যেমন সেবার হঠাৎ কয়েকজন পুলিশ সারারাত তেল খরচের চুক্তিতে বাগুইহাটি বসিরহাটের রাস্তায় সারারাত কাটিয়ে রাস্তার লোড বোঝাই গাড়ীগুলোকে ধমকে ধামকে এক রাতেই চার-পাঁচ হাজার টাকা কামিয়ে ভোর চারটের সময় বসিরহাটের তাড়িওলাকে ঘুম থেকে তুলে তাড়ি খেয়ে টইটম্বুর হয়ে মাছপটিতে হানা দিয়ে চারটে রুই-কাতলার বাণিজ্য করেছিল। সেদিনের সেই স্ববিরোধের মধ্যে তার নির্লিপ্ত উদাসীনতার ফলে সে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাব সমস্যার জায়গায়। সেদিনও সে তলিয়ে যায়নি। এইসব কলকাতার ভ্রষ্টাচারের দিনগুলির তলানি খেয়ে কলকাতায় বেঁচে যাওয়ার পথে বড় কষ্ট বলে সে ফিরে এসেছিল তার গাঁয়ে। কেননা গাঁ এখন তার ছেলেকালের গাঁ নয়। গাঁয়ের আর্থসামাজিক পরিবর্তন তাকে সাহস দিয়েছিল। তাই নেড়া অতি সন্তর্পণে খেটেখুটে না খেয়ে না পরে মাইনের টাকা আর মালিকের তেল বিক্রি করে যে কটা পয়সা জমিয়েছিল তা দিয়েই একটা পুরানো অটো রিক্সা কিনে এনেছিল, তাদের একান্ত শহর ঘামে

ঘামের রাস্তাঘাট এখনো অপরিসর। পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য একটা পাঠাগার, একটা নদী আর ক'জন ঢরঢরে রাজনৈতিক নেতাকে নিয়ে দিন যাপন করে চলেছে।

এতে তার বিরক্তি নেই কিন্তু আসক্তি আছে প্রচুর। এ শহরে নেড়া তার অটো চালাবে না। এই ঘাম থেকে মাছমারা, উদোমপুর, রাণীবাঁধ সহ অনেকগুলো রাস্তা চলে গেছে। আগে এইসব রাস্তায় জানু ভর্তি কাদা আর দু'পাশে মানুষের নোংরায় নোংরা থাকত। কিন্তু এখন সেগুলো মোরাম হওয়ায় পথ-চলতি রাস্তায় অটো চলছে। রাণীবাঁধের রাস্তায় ইতিমধ্যেই অন্তত আটদশটি অটো নেমে গেছে।

স্ট্যাণ্ডে নেড়ার রথ এসে থামলো। নেড়ার অটোর নাম রথ। রথ ঠেকাতেই অটোওলারা রে রে করে উঠলো। এখন তো হিউম্যান বাদ দিয়ে ইউনিয়নের যুগ। সবটা একা কেউ পারে না। তাই ইউনিয়নের হিউম্যানরা চীৎকার করে বলে দিল 'এখানে দাঁড়ানো যাবে না। কেননা ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' নেড়ার প্রশ্ন জাগে। নেড়া মৃদু হাসে। আর পিট্‌পিট করে তাকায়। অটো পাড়ার ইউনিয়ন নেতা তনু চক্কোতি খেপচুরাস হয়ে গেল। বললো 'অভি সরাও, নাহলে ভেঙ্গে দেবো?' নেড়া তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে উদাসীনতার সঙ্গেই জিগ্যেস করলো 'কেন অটো দাঁড়াতে পারবো না?'

—'ইউনিয়নের পারমিশন নিয়ে তো অটো কেনোনি। তবে দাঁড়াতে দোব কেন?'

'ইউনিয়ন?' হেসে ফেলল নেড়া। 'কে ইউনিয়ন? কেন ইউনিয়ন? ইউনিয়নের পারমিশন নিয়ে অটো কিনব না অটো কিনে ইউনিয়নের সদস্য হব?' সে জিগ্যেস করে।

প্যাঁচে পড়ে চক্কোতি বললে। 'সে সব পরের কথা, অভি সরাও।'

নেড়া বলেছিল, 'আপনার ইউনিয়নই যে করতে হবে তার কি কোন মাথার দিব্যি আছে? আপনার মতের সঙ্গে জোর করে আমাকে মেলাতে হবে এমন দায় তো আমার নেই, অন্তত; সেকথা বলে তো জন্মাইনি; তবে আমাকে হেনস্তা করছেন কেন? আমাকে উৎসাহিত করুন যাতে আপনার অন্তর্গত হই। তা না করে আপনি আমার ক্ষতি করতে এসেছেন? তাছাড়া আপনি তো অটোম্যান নন তাহলে বুঝতেন আপনার এই 'না' কথাটা কতটা আপত্তির। এবং দুঃখের।' চক্কোতি দেখলো লোকটা দমবার নয় এবং বেশ সুন্দর কথা বলে অন্তত তার চেয়েও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একে দমানো দরকার। তাই অন্যান্যদের বললো 'আপনারা দেখুন। ও আসলে দালাল আমাদের ঐক্য ভাঙ্গতে চায়। কোন কথা নয়, অটো সরাও না হলে ভাঙ্গচুর করে দেব।' বলেই কল্পিত হুমকী দেখিয়ে হাত নাড়তে থাকলো, অন্যরা বুঝেছে 'অন্যায়' তবুও একটু তেড়ে আসতেই নেড়ার ভয় হলো। নেতা বলতে থাকলো, শাসন করছি আমরা। প্রলেটারিয়েত ডিকটেটরশিপ্ এভাবে এমনি এমনি থাকতে পারে না। একটু চাপ দিতে হবে বৈকি? উনি জানেন না যে তৃতীয় জনকে আসতে হলে পারমিশন নিয়ে আসতে হয়। এখনই ওকে গাড়ী সরাতে হবে না হলে চুরমার করে দেব। হটাও গাড়ী। অন্যান্য অটোম্যানরা রে রে করে উঠতেই নেড়া একটু ভড়কে গেল। তার দুঃখ হল এই ভেবে যে 'কত অবৈজ্ঞানিক আর কতটা যুক্তিহীন এরা। গাড়ী বাড়বে, লোক বাড়বে, বাড়বে রাস্তার ব্যস্ততা কিন্তু তা না করে এরা বলছে

আর গাড়ী বাড়বে না এটা কেমন কথা! এরা কারা। এরা কী ইউনিয়ন?' সে ভাবলো 'এ শালা কোন কুত্তার দেশে এসে হাজির হলুম রে আমি, নিজের গাঁটের টাকায় গাড়ী কিনে নিজে গাড়ী চালাবো তাও পারব না! রুট না পেলে আলাদা কথা কিন্তু রুট পেয়েও বাধা দেবে এরা। এরা কী প্রাণী!' একটু ভয় একটু বিরক্তিতেই অগত্যা গাড়ী ঘুরিয়ে নিল নেড়া। দূরে পিচ রাস্তার ধারে ঠেকিয়ে দিল, যেখান থেকে রাণীবাঁধের যাত্রী ধরা সম্ভব নয় কখনই, কোনভাবেই।

মনটা খারাপ হোল নেড়ার। কিন্তু প্রকৃতিতে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে সব সময়ই। যে যতই হম্বি-তম্বি করুক হিংস্র হোক তার অলক্ষ্যে তার হিংসায় তম্বি-হাম্বিকে ধ্বংস করবার জন্য অন্যজন থাকেই। অন্যজন দেখে। যারা দেখেছিল তারা হেসেছিল সেদিন। কেননা যে জায়গায় স্ট্যাণ্ড সে জায়গার মালিক ছিল অন্যজন, ইউনিয়ন নয়। নেড়ার হেনস্তা দেখে নেড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করল তারাই। যেটা ইউনিয়নের করবার কথা সেটা মালিক করল। বিনম্র নেড়া দেওয়া-নেওয়ার ভিত্তিতেই ফয়সালা করল নিজেকে।

.সূর্যোদয় হতে এখনো একটু বাকী। নেড়া সকাল সকাল প্রথাগত স্নান সেরে নিয়েছিল তারপর খেটে-খাওয়া মানুষেরা যেমন হয় পাঁচদিকে গড় ঠুকে তেমনিভাবে চারদিকে মাথা ঠুকে রথকে নিয়ে রাস্তায় এসে হাঁকতে থাকলো 'ঘামে যাবেন কেউ। ঘাম।' এসে যেতেই পাঁচজন লোক ছুটে এলো। তাদেরকে নিয়ে রথ ছুটে গেল ঘামে।

তখন দু'চারটে গাড়ীও এসে গেছে। পাশের বাজারে কেউ কেউ পসরা নিয়ে বসে গেছে। তার পাশেই স্ট্যান্ড। সোজা রথ থামলো স্ট্যান্ডে। রথ এসে যেতেই স্ট্যান্ডের যারা মালিক তারা হাসতে হাসতে নেড়াকে স্বাগত জানাল 'আসুন। আসুন।' অন্যান্য অটো মালিকেরা কেউ কিছু সকালে বললো না। কিন্তু অন্য সময় কি বলবে? নেড়া তাদের নিয়ে চা খেতে থাকলো। লোকগুলো চলে যাবার পর অটোর ইউনিয়নের লোকেরা ভ্যাল ভ্যাল করে দেখছিল। রাগ হচ্ছিল তাদের 'শালা ভাগ বসাতে এলো।' তারা বলাবলি করলো 'ইউনিয়নের নেতা যেমন আমরাও তেমন। যা করবার মুরোদ নেই তাতে হাত দেওয়ার কি দরকার।' নেতাকেই দোষারোপ করল তারা।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে নেড়া হাসতে হাসতে কুশল বিনিময় করতে গেলে পাত্তা দিল না ইউনিয়নের অটোচালকরা। তারা যেন নেড়াকে ভিন গ্রহের লোক হিসেবে দেখছে। যেন খাঁটি শত্রু।

বিপন্ন প্রজাতির মতো একাই দাঁড়ালো। আজ যেন দ্বীপবাসী সে। একা। চারদিকে ষড়যন্ত্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একা বিস্ময় বিমুগ্ধ সে। বাইরের আচরণে খারাপ লাগলেও সে দাঁড়িয়ে রইলো। ঋজু হয়েই। যেহেতু সে ইউনিয়নের কেউ নয় তাই লোক জুটলেই সে হেঁকে নেয় আর তার গাঁয়ের পরিচিত লোকেরা নিয়ম ভেঙ্গে উঠে পড়ে। কোন অপেক্ষা না করে সোজা বেরিয়ে যায়। আবার আসে। কেউ কথা বলেনি তার সঙ্গে।

রয়েই গেল। সবার সঙ্গে তো কথা বলা যায় না। তার গোয়ালে যে গরু আছে তাদের প্রতিদিন যত্ন-আত্তি করেও তো তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। তাই নেড়া ভাবে যারা বলবার যোগ্য তাদের সঙ্গেই বলা উচিত। সবার সঙ্গে তো কথা বলার দরকার নেই। সে সিদ্ধান্ত নেয় অনিয়মটাই যেখানে নিয়ম সেখানে নিয়মটা ভেঙ্গে দেওয়াই দরকার। নেড়া কলকাতায় থাকার সময় অনেক নয় দু'চারজন বড় নেতার সঙ্গে মিশেছে, খুব কাছ থেকে তাদের আচরণ সে খেয়াল করেছে। দেখেছে। তাতে সে বুঝেছে ভালই, তার ধারণাও যথেষ্ট স্বচ্ছ। সে সময় তার একটা শ্রেণীচেতনাও গড়ে উঠেছিল। সে চেতনা তার আছে। সে ভুলে যায়নি। তাই সে মনে করে যে বিশেষ একটা ছাপের উপর আসক্তি ও কৃতজ্ঞতা থাকলেও সেই ছাপ যে বহে নিয়ে যাচ্ছে তাকেও ভাল হতে হবে বৈকি। ফালতু লোকের হাতে মূল্যবান জিনিস থাকলেও সেই জিনিসের লোভে ফালতু লোকের সঙ্গ পাওয়া উচিত নয়। সে জানে মন্দিরের দেবতার উপর শ্রদ্ধা থাকলেই মন্দিরে যাওয়া যায়নি, যদি মন্দিরের পুরোহিতের উপর শ্রদ্ধা না থাকে। ইউনিয়নের উপর আনুগত্য থাকবে ঠিকই কিন্তু যোগ্য লোককে ইউনিয়নের নেতৃত্বে থাকতে হবে। যার আচরণ হবে চুম্বকের মতো। নিমাই নবদ্বীপ ত্যাগ করলে দেশ কাঁদে, কৃষ্ণ মথুরা গেলে মানুষ কাঁদে পুজো করে কিন্তু এখনের নেতা রাস্তা হাঁটলে পেছনে লোকে ব্যঙ্গ করে। এখন সব ছোট্ট মানুষকে বড় দায়িত্ব দেওয়া হয়, বড় মানুষের জন্যে ছোট জায়গায় রাখা হয়; যেন শূলে চড়ানো হচ্ছে। নেড়া মনে মনে ভাবে 'বাধা দিলি দে, কিন্তু বাধা দেওয়াটা অনিবার্য ছিল না।'

ভেতরে ভেতরে কার কি আলোচনা চলছিল নেড়া তা জানে না। জানবার প্রয়োজনই হয়নি কিন্তু ক'দিন ধরেই এ গণ্ডগোল পাকাবার চেষ্টা করছিল যাতায়াতের সময় নিয়ে। ফয়সালা এখনো হয়নি।

সকাল থেকেই শোনা যাচ্ছে অটো মালিকরা সব সন্ধ্যায় অন্নপ্রাশনে গাড়ী নিয়ে খেতে যাবে। প্রত্যেকের নেমতন্ন। কথা ঘুরে ঘুরে কানে এসেছে তারও। নেড়াকে কেউ নেমতন্ন করেনি কেউ বলেনি। কৌতূহল হয়েছে আগ্রহ হয়নি সন্ধ্যা হতে আর কিছুক্ষণ বাকী। অন্ধকার নামলো বলে। এখনই গাড়ী ধরবে বলে কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নেড়া দাঁড়িয়ে ছিল কাছেই। উদাসীন ভাবেই দাঁড়িয়েছিল। এক দু'জন অটো মালিক বলেছিল যে আজ গাড়ী যাবে না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নেড়ার সামনে দিয়ে পরস্পরকে ডাকাডাকি করে মজা করতে করতে নেমতন্ন বাড়ী চলে গেল তারা। দাঁড়িয়ে রইল নেড়া। মুখের রা পর্যন্ত কাটলো না কেউ। একটা অনুষ্ঠানে পেট পেতে খাওয়াটা বড় নয়, নেড়া একটা সৌজন্য আশা করেছিল যে ওরা অন্তত বলে যাবে 'আসছি'। না কেউ নেড়াকে বলেনি। একটা কথাও বলেনি। কেন বলল না তারা? কেন তাদের এই

নীচতা. এই দৈনতা? এর বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে উঠেছিল সে। সে সুযোগের অপেক্ষায় থাকল।

মাসখানেক যেতে না যেতেই চক্কোতি তাকে ডেকেছিল একটা চা দোকানে। নেড়া ভেবেছিল অনেক কিছু, তাহলে কি পাল্লা খুলে গেল। হয়তো মনুষ্যত্ব বোধ জেগে উঠেছে। ইউনিয়নের নেতা! কত কি ভাবছিল সে। নির্দিষ্ট দোকানে নির্দিষ্ট সময়ে যেতেই দোকানের পর্দার আড়ালে ঢুকে গেল তারা। দোকানের এই পর্দায় ছেলেমেয়েরা বসে। যারা লজ্জা পায়। যারা একটু আড়াল চায়। যারা বিয়ার-টিয়ার খায়, একটু আড়ালে খায় আর প্রকাশ্যে ন্যাংটামো করে। নেড়া বললো 'দাদা একেবারে আড়াল হয়ে গেল যে।'

—'এটা আড়ালেরই কাজ।' চক্কোতি বললো।

'কী ব্যাপার বসুন দেখি' সত্যিই কৌতূহল হচ্ছিল নেড়ার।

চপ্ আর কাটলেট সহ চায়ের অর্ডার দিল চক্কোতি। সন্দেহ হোল নেড়ার। এরকম তো হবার কথা নয়। রোদ বেরিয়েছে তো আজ।

নেড়া একটু ভান করেই বললো 'একটু তাড়া আছে, দয়া করে দ্রুত বলুন।'

নানা কথা নয়। আছিলাও নয়। যেন অনেককালের চেনা গলায় চক্কোতি বললো 'একটা এল. আই. সি. করো'।

নেড়া মৃদু হাসলো। তেমনি নির্লিপ্ত তেমনি উদাসীনভাবে হেসে বললো 'শুনেছি বৌদি সরকারী চাকরী করে। আপনিও শিক্ষক। আবার এল. আই. সি-র এজেন্ট প্রলেতারিয়েট নেতা এত টাকা রাখবেন কোথায়?'

চক্কোতি এখন যেন নেড়ার নিজের পেটের ভাই। নেড়া এখন দাদা যেন। একথা সে কথা। এ অঙ্ক সে অঙ্ক। কত অঙ্ক চপ্ কাটলেট চা খাবার পর নেড়া বললো 'বীমা আমার দরকার, একটা ছোট্ট বীমা আছে। এখন নয়, পরে।' নির্লিপ্তভাবেই ব্যস্ততা দেখিয়ে উঠে গেল। বীমা করেনি নেড়া। এর কাছে কেন? ঘৃণায় মুখ বেঁকেছিল তার। সে জোর করে বলতে পারেনি। কেননা সে নেতা বলে। যদিও সে তার নেতা নয় কিন্তু একটা ইউনিয়নের তো নেতা। কিন্তু নেতা বলেই কি নৈতিকতা থাকতে নেই। আমি অটো চালাবো খেটে খাবো আমার অটো চালানো বারণ, কিন্তু গরীবের নেতার কেন এতভাবে আয় করতে হবে? আমাকে ইউনিয়নে নেওয়া যায় না অথচ আমার পয়সায় তার বীমা করা যায়। সে বলে 'আসছি'।

অনেকদিন পরে মুখটা লাল হয়ে ওঠে চক্কোতির। তার মুখের ওপর না বলবে এরকম সাহস সে বরদাস্ত করে না। থাবড়ে চুরমার করে দিতে পারে সে। শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাই তার লক্ষ্য। তাই শ্রমিকের স্বাধীনতা সে বিশ্বাস করে না। নেতৃত্বের কেন্দ্রিকতাই কাম্য। এরকমই শেখানো হয় বলেই শিখেছে সে। গণতন্ত্র আর দেশপ্রেমের সুগার কোটিনের নীচে ব্যক্তিগত নীচতা আর যৌথ শঠতার স্বেচ্ছাচার। কিন্তু এই শঠতা

আবার সবার নেই। কোয়ালিটি হীন কর্মী আর নেতৃত্বের মধ্যেই এই হীনতা বাসা বেঁধে আছে। অনেক উদারতা অনেক প্রসারণ আছে অনেক নেতৃত্বের হৃদয়ে কিন্তু এর নেই কেন? কেন নেই! সেব কথা ভাবে নেড়া।

নির্দিষ্ট শীটের বেশী লোক বহন করা অন্যায়। আইন বিরুদ্ধ। কিন্তু গাড়ীর মালিকতো আর লোক ডাকতে যাচ্ছে না যে সবাই আমার গাড়ীতে যাতায়াত করো বরং লোকেই তার নিজের প্রয়োজনে গলদঘর্ম হয়ে গাড়ীতে চড়ে। কিন্তু এমন বিপজ্জনকভাবে গাড়ীতে ওঠা তো একদম কাম্যই নয়। ঘাম থানা তাই আইনের দাসত্ব মেনে গাড়ী ধরে থানায় নিয়ে যায়। কেশ দেয় 'টাকা দিবি ছেড়ে দোব' এইভাবেই চলবে।

মোড়ে সেদিন বিকেল চারটেয় সব গাড়ীগুলোকে থানা সিজ করেছিল। চক্কোতির মুসাবিদায় থানা একটা ফয়সালা করে বারশ টাকা গাড়ী প্রতি নিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। কেশ দেয়নি। ঘামের থানা নাকি খুবই দরদী সে তাই কেশ দেয়নি কারো নামে।

নেড়ার গাড়ীও থানায় আটক হয়ে আছে। বিকেল থেকেই অস্বস্তিতে ফিরছিল নেড়া। থানার সামনেই বাসস্ট্যান্ড। বাসস্ট্যান্ডের ধারে সে মন খারাপ করে বসেছিল। ইউনিয়নের সঙ্গে নয় একাই ফয়সালা করতে আগ্রহী। রাত দশটায় যখন ওরা সবাই হাসতে হাসতে বারশ টাকা দিয়ে গাড়ী নিয়ে ফিরছিল তখন নেড়ার বিরস বদন। সে অত টাকা দেবে কি করে? কত তার আয়। কত বা তার খরচ। হিসেব কি থানা জানে। থানা জানে আইন আর টাকা। সে ভাবে 'যা শালা ও গাড়ী পড়ে থাক থানায়। ছাড়ানোর দরকার নেই।'

সবাই চলে গেলে রাত এগারটায় পা মেরে মেরে হাজির হোল নেড়া। থানা চত্বরে যেতেই সেন্ট্রী বন্দুক তুলে বললো 'কে আপনি? নেড়া হাত তুলে নিজের পরিচয় দিলো।'

একজন এস. আই. বললো 'তুই শালার এই সময় হোল?'

কথাটা ঝপাং করে কানে বাজে। চব্বিশ ঘণ্টার অফিসে এমন সম্ভাষণ শুনবে সেটা ভাবতে খারাপ লাগে অথচ পুলিশ মন্ত্রী কত কথা বলছেন; বলছেন, 'খেলো হে পুলিশের সঙ্গে খেলো।'

নেড়া উত্তর দিল না। বড় বাবুর ঘরে ঢুকে গিয়ে বললো 'স্যার।'

—'এত দেরী করলি কেন? সবই শুনেছিস্। টাকা দিয়ে গাড়ী নিয়ে যা।'

নেড়া দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলল না। বড়বাবু বললেন 'কিছু বলবি?'

—গাড়ীটা রেখে দিন স্যার! 'আমার গাড়ীর দরকার নেই। বরং আপনার ঘরে আমাকে কাজের জন্য রাখন স্যার! যা বলবেন তাই করব. আমি গাড়ী ছাড়াতে পারব না। এতো স্যার ভাঙা গাড়ী কি আর. কী বা দিই. ও রেখে দিন স্যার।' কথাগুলো এত মাধুর্য দিয়ে নেড়া বললো যে বড়বাবু মুখ তুলে দেখে নিলেন ছেলেটাকে। কী বলছে 'ছোঁড়া'। সত্যিই কি ছোঁড়া টাইপের লোকটা। কই নাতো বড়বাবু ওর থেকে না হয়

ছয়-সাত বছরের সিনিয়র হবেন। তা বলে ছোঁড়া। খারাপ লাগে নেড়ার কিন্তু কিছুই বলতে পারে না।

বড়বাবুর কেমন মায়া হোল ছেলেটার উপর। নেড়া বললো 'স্যার আমাকে ইউনিয়নে ওরা নেয়নি। কেউ আমার নেই। আমি একা স্যার আমি অত পারব না দিতে।'

বড়বাবু বললেন 'কত দিবি।'

'স আড়াই আছে স্যার।' শরীরের সব জায়গা থেকে খুঁজে পেতে বের করে নেড়া। তারপর টেবিলের উপর সেগুলো রেখে দেয়। বড়বাবু বলে, 'যা দেখেশুনে চালাবি।' ওদেরকে বলবি না। দরকার হলে একাই আসবি। কাউকে ধরতে হবে না।

কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে নেড়া বড়বাবুর পায়ের ধূলো নেয়। নেড়ার চোখে জল।

বড়বাবু বলেন 'তোর আর কে আছে?'

—সব আছে, দিদি দাদা ভাই। কেবল মা, বাবা কেউই নেই। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

বড়বাবু একটু কঠোর। তার মায়া-দয়া থাকতে নেই। সে বললো 'যা পালা।'

নমস্কার করে থানা থেকে বেরিয়ে এলো নেড়া। এসেই গাড়ীটায় দু'তিনবার হ্যান্ডেল চালাতে গিয়ে স্ট্যার্ট হল না।

বড়বাবু দেখছিলেন জানালা দিয়ে নেড়া কি করে কেমনভাবে যায়। গাড়ী স্ট্যার্ট হয়নি দেখে কেমন খারাপ লাগে তার। ছাপোষা সংসারের ছেলে এরা, এদেরই বা দোষ কি? জানালা থেকেই বড়বাবু সরাসরি ডাকেন 'এই নেড়া! আয় এদিকে আয় একবার।'

নেড়ার একটু ভয় হয়। আবার কেন? পা মেরে মেরে আসতে থাকে। বড়বাবু ধমক দিয়ে বলেন 'তাড়াতাড়ি আয়'।

কাছে হাজির হতেই গম্ভীর মেজাজে ভাল করে দেখলেন তিনি। তারপর বললেন 'টেবিলের টাকাগুলো নিয়ে যা, গাড়ীর জন্য খরচ করবি।'

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো নেড়া, ঠিক বুঝতে পারছিল না। বড়বাবু এবার হাসতে হাসতে বললেন 'নে নিয়ে নে তোর লাগবে না।'

নেড়া টাকাগুলো নিল। আবার ফের কৃতজ্ঞতায় নুয়ে তাকে প্রণাম করলো। বড়বাবু বললেন 'ভালভাবে কাজ করবি। দরকার হলে নির্ভয়ে আসবি।'

গাড়ীতে স্ট্যার্ট দিলো যখন তখন সেন্ট্রী ঢংঢং করে থানায় ঘণ্টায় বারোটা বাজাল।

রাণীবাঁধ ছেড়ে এলে মাঠ। খাঁ খাঁ মাঠ। মাঠে ধান কাটছে চাষীরা। বৈশাখ মাস। এ মাঠে সকাল বেলায় ছড়ানো ছিল প্রসন্ন হাওয়া কিন্তু এখন ফসল নেই। সমস্ত ধান উঠে গেছে চাষীদের খামারে। দু'চারটে কুকুরও ঘুরছে. একটা লোককে তালগাছে উঠে তাড়ি পাড়তে দেখা গেছে মাত্র। সামনেই খালুই গ্রাম। বাগদী আর তিওরের বাস। শ্রমজীবি মানুষ এরা। এরা আগে অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হোত. এখন তা হয় না! নেড়ার রথে

বার তের জন যাত্রী আছে। সবাই ওরা গ্রামে যাবে। দ'একজন মাঝখানে নেমে গেলেও গ্রাম পর্যন্ত যাবেন অধিকাংশ যাত্রী। একজন মাষ্টার মশাই উঠেছেন। তিনি গাঁয়ের স্কুলে চাকরী করেন। গাঁয়েই সব কিন্তু থাকেন শহরে। শহরের বাবু হয়েছেন তিনি।

খালুইয়ে রথ আসতেই দু'তিনজন লোক হঠাৎ মত্ত অবস্থায় খেউড় করতে করতে দাঁড়িয়ে গেল। গাড়ী থামবার আগেই লোকটা লাঠি নিয়ে ধাঁ করে মারলো কাঁচের উপর। লাইটটা গেল ভেঙ্গে। গাড়ী থামবার আগেই যাত্রীরা ভয়ে নেমে পড়ল দ্রুত। কিছু বলতে না বলতেই তারা নেড়াকে মারবার জন্য উদ্যত হোল।

তার ক্ষতি হয়ে যাবে ভেবেই নেড়া লোকটার লাঠি সহ ধরে ভয়ংকর চিৎকার করে মাটিতে ফেলে দিল। বড় কিছু ঘটে যাবার আগেই স্থানীয় লোকেরা পরস্পরকে ছাড়াছড়ি করতে থাকলো। নেড়া যাকে ফেলে দিল তার হাঁটুর অনেকটা কেটে গেল মোরামে। সে গালাগালি করতে থাকলো। নেড়াকে মারমুখী হোল অন্যরা।

নেড়া হাত জোড় করে বলতে থাকলো 'গাড়ীটা কী দোষ করেছে কিছু বলবার আগেই কিছু ঘটনা কেন? কেন আমাকে হেনস্তা করছেন। গাড়ীটা ভাঙছেন? তার গলায় সবিনয় কাকুতি ঝরে পড়লো। লোকগুলো গালি দিয়ে বলতে থাকে 'তুই শালাই তো হারামি বাচ্ছা। ইউনিয়ন করছিস্ না। তো গাড়ী চালাবি কেন?' আরো খেউড় আরো গাল দিতে থাকলো সে।

নেড়া বললো 'ঠিক আছে আমি গাড়ী চালাবো না', আমাকে গাড়ী ফেরত নিতে দাও।' গাড়ীর ফাষ্ট এডের বাক্স থেকে ডেটল ব্যান্ডেজ নিয়ে ওর রক্ত মুছে শুশ্রূষা করতে থাকলো। মাষ্টারমশাই একটা কথা বললো না। নেড়া কেঁদে ফেলল। বললো, 'তোমরা আমার গাড়ীটা ভেঙ্গে দিলে শুধু কি আমিই সমস্যা? ইউনিয়ন নয়? ওদের কথাই সব? তোমরা জানো আমার সঙ্গে কি হয়েছে?'

লোকগুলো কেমন হীনবল হয়ে গেল। অন্যরাও তেমন চীৎকার করল না। একটা অটো এসময় আসতে দেখে নেড়া তাকে ডাকবার চেষ্টা করল কিন্তু সে ঘাড় না ঘুরিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল।

নেড়া তার হাতটা ধরে বললো 'লেখাপড়া শিখেছিরে ভাই, কোথা থেকে কি হয় জানি।'

লোকটা বলে আপনি 'চক্কতিদাকে অপমান করেছেন।' ক্রুদ্ধ হয়েই বলে সে।

নেড়া দুঃখেও হেসে বলে 'তা বটে তার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। এসব রাজনীতি পুরানো দাদা। এসব মিথ্যাচার সহ্য করে না। এসব মিথ্যা কথা। অন্যায়।'

রোদ প্রচণ্ড। হাওয়া নেই কাছেপিঠে কোন নলকূপ নেই যে জল পাওয়া যাবে, তেষ্টা লাগছিল। মাষ্টারমশাই এতক্ষণ কোন কথা বলেননি এবার নেড়াকে দোষারোপ করে বললেন 'তোমার গাড়ী চালানো উচিত হয়নি। যত্তসব ঝ্যামেলা।' এমন ব্যাজার

হলেন তিনি, যেন তিনি কত কাজের কাজী। এর সম্পর্কে নেড়ার ধারণা আছেই সে আর কথা বললো না। অন্যান্য যাত্রীরা যতটা সহযোগী এই মাষ্টার লোকটা ঠিক ততটা সহযোগী নয় বরং একটু বেশী সুবিধাবাদী।

নেড়া হাত জোর করে বলে 'আজকের দিনটা ছেড়ে দিন ভাই এদের গ্রামে পৌঁছে দিই, আমি আর গাড়ী চালাব না। দয়া করে ছেড়ে দিন।' প্রায় কেঁদে ফেলল নেড়া। মনে মনে ভাবলো 'কত হিংস্র কত খল হতে পারে মানুষ!'

লোকটা বললো 'শালারা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে মার খাওয়ালো, সব কুত্তাবাচ্চা সমান। আমিও শালা দেখে ছাড়ব। যান আপনি চলে যান।' গাল দিতে দিতে চলে গেল।

কেন লোকগুলো এরকম করলো কেউ বুঝতে পারুক আর না পারুক নেড়া বুঝেছে এটা রাজনীতি হচ্ছে। এবং চক্কোত্তি যে রাজনীতি করলো তা বুঝতে তার বাকী রইলো না।

নেড়া সবাইকে বললে, 'চলুন উঠুন গাড়ীতে।' রথে উঠার আগে ভাঙা কাঁচের দিকে তাকিয়ে চোখের জল সামলাতে পারল না। গাড়ী যত এগোতে থাকল, তার চোখ ফেটে জল টুপটুপ করে পড়ছিল।

খালুই পার হলেই আর একটা মাঠ। সেখানে কোন গাছপালা নেই। ফাঁকা। আরো ফাঁকা। হঠাৎ গাড়ী থেমে যেতেই পিছনের শীটে বসা যাত্রীদের বললো 'প্লিজ একটু নামুন না স্যার।' সবাই নামলো মাষ্টারও নামলো। পুনরায় অন্যদের তুলে নিল সীটে। মাষ্টারকে বললো 'সরি এক মিনিট। গাড়ীটায় স্ট্যার্ট দিই।'

গাড়ীটায় স্ট্যার্ট দিল। মাষ্টার চাপতে গেলে বাধা দিল সে 'আপনার জন্য গাড়ী কিনিনি অন্য গাড়ীতে যাবেন আপনি। একদম চাপবার চেষ্টা করবেন না।' যাত্রীরা অনেকেই মাষ্টারটিকে চিনত বলেই হাসাহাসি করল। ঠাসাঠাসি থেকে অন্তত একজন তো কমল। নেড়ার গাড়ী বেরিয়ে গেল। সে চীৎকার করে বলে গেল, 'লোকে অযথা মারবে আমাকে আর আপনি আমাকেই দোষারোপ করবেন ঠায় দাঁড়িয়ে, তাই আপনার মতো লোককে নেওয়া যায় না। আমরা আসছি।' নেড়া একটু রূঢ় ভাবেই বলল, কিন্তু কটূ বলল না।

মাষ্টার লোকটা সেই ঠা ঠা রোদে একা দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে গাড়ীর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর দরদর করে ঘামতে ঘামতে নেড়ার উদ্দেশ্যে গালাগালি করে হাত ছুঁড়ে চীৎকার করে অশ্রাব্যভাবে বলতে থাকলো 'আচ্ছা আমিও দেখে লুব তোকে।' আরো খেউড় আরো খেউড় করতে থাকলো নেড়াকে।

নেড়া ভ্রূক্ষেপ না করেই রথ চালিয়ে গ্রামের দিকে ছুটে চলল তার উত্তেজনা আর দুঃখ নিয়ে। পেছনের একটা কথাও তার কানে গেল না। নেড়া এগোতে থাকলো দূরলক্ষ্যে।

গাছ

তেমন করে মনে পড়ছিল না তার। প্রায় কত বছর কেটে গেছে। তারপর কতদিন কতরাত্রি কত কান্না-শোক-দহন-যন্ত্রণা বয়ে গেছে তার উপর দিয়ে। প্রতিদিনের বেঁচে থাকাটাই যেন আকস্মিকতার মধ্যেও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। এই আকস্মিকতার উর্ধ্বে সে যেতে পারেনি। তাই তার আর কাউকেই মনে করতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু রাতে যে ঘটনা ঘটে গেছে সে ঘটনা তার চোখের সামনে নেংচে নেংচে বেড়ে উঠেছিল। সকালে উঠতে পারছিল না বিছানা থেকে। তার নিজেকে অবসন্ন মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার চোখে যেন জল আসে বটে, কিন্তু তার আর কাঁদতেও ভাল লাগছিল না।

দুগ্‌গী একটা ছেঁড়া ছাপা শাড়ী পরেছিল। শত দুখেও সে আলগা গায়ে কোনদিনও থাকে নি। কুটুমবাড়ী থেকে চেয়ে আনা ব্লাউজটার হাতা মেরে সে পরেছিল। বগলটা গেছলো কেটে। উঠোনে ছড়ানো ছিল ভাঙা টালি। খড়। ভাঙা দু'চার টুকরো বাঁশ। নোংরা—একদম নোংরা কাঁথা। বালিশ তো না, বালিশের মতন একটা কি? খানিকটা বমি। বমির অংশ। কুকুরে খানিকটা খেয়ে নিয়েছে। রাতে যে একটা কিছু ঘটেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছিল গন্ধ থেকে। একটা উগ্রতার ভাঙ্গা গন্ধ।

দুগ্‌গীর কপালটা কাটা। অনেক বছর আগের কাটা। পাকা তেচল্লিশ বছরের মেয়েটি কপালে সিঁদুর দিয়ে একটু পরিষ্কার কাপড় পরে নিলে তাকে দুগ্‌গী বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস করা যাবেই বা কেন। মেদ মাংসে কালি ঝুলিতেও সে একজন সুন্দরী।

পানিরাম সেই রাতেই কোথায় গেছে কেউ জানে না। আবার কখন তেড়ে আসবে কে জানে। নাবালক তিনটে শিশু কন্যার জন্য পানিরামের কোন দায় নেই দাখিন্যও নেই। পেটে ধরেছে বলেই যেন দুগ্‌গীর যত সমস্যা। তবুও বড় ছেলেটি বউ নিয়ে আলাদা হয়েছে।

বাপের ভিটে মাটি বিক্রী করে যখন কয়েক গোছা আখ, অড়হর কলাই, বেড়ের বরবটি শুটি 'গোটা কতক শশাবীজ পুঁটলী করে তিনটে ছেলের হাত ধরে পানিরাম দুগ্‌গীকে নিয়ে ভাগ্নার ঘরে উঠেছিল' ভাগ্না বলেছিল 'তোমার কোন ভয় নেই মামী আমরা তো আছি।' পানিরামের দিদি লতা পানিকে বলেছিল 'চার ভাই বোন এক জায়গায় থাকব। তোর কুন চিন্তা নেই।' তখন আবেগ—আপ্যায়ন—ভালবাসা উপচে পড়ছিল যেন।

দুগ্‌গীকে খুবই খারাপ লেগেছিল সেদিন। নিজের ঘরদোর বিক্রি করে করে নিঃস্ব হয়ে মাত্র এক কাঠা ভিটে কিনে বসবাস করবে ননদের চোখের কাছে, তাকে ভাল লাগেনি। সে অনেক আপত্তি করেছিল পানিরামকে। পানিরাম তার কথা শোনেনি। দুগ্‌গী

জানে পানিরাম কথা শুনবে না। কথা শোনেনি বলে পানিরাম তার প্রথম পক্ষের বৌকে চড়িয়ে মেরে চৌকাঠে টাঙিয়ে দিয়ে নেশার ঘোরে পড়েছিল উঠোনে। সে খুনী। এক কাঠা দু'কাঠা করে বার বিঘে সম্পত্তিসহ টিনের ঘর, পাকার ঘাটসহ পুকুর বিক্রী করে দিয়েছে। হাওড়ার লেদ মেশিনের কাজ করতে গিয়ে মালিকের সঙ্গে গণ্ডগোল করে পালিয়ে এসেছে। সারা জীবন ধরে বিক্রী করতে করতে তার ননদের কাছে বৌ ছেলেকে বিক্রী হতে দেওয়া মেনে নিতে পারছিল না সে। আপত্তি করেছিল বলে সেদিনও দুগ্‌গীকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছিল। তার মামা তখনকার আমলের এম. এল. এ. হলেও কিছু করতে পারেনি। করার ছিল না। তবুও দুগ্‌গী ঘর চেয়েছিল, সংসার করেছিল। একমুঠো খেয়ে পরে পরিশ্রম করে হাসি মুখে চলে যেতে চেয়েছিল।

সে পারছে না। কিছুতেই আর মেলাতে পারছে না। তার সারা শরীর ব্যথায় টান টান হয়ে গেছে। সারা রাত জুড়ে চুরচুর নেশায় কীর্তন করেছে পানিরাম। চীৎকার করেছে দুগ্‌গী। কেউ আর নজর দেয়নি। ভাগ্না না। ননদ না। প্রতিবেশী না। পঞ্চায়েত না। কেউ না।

আগে আগে এরাও চেষ্টা করেছে কিন্তু কিছুতেই তারা এদের একটা সুস্থির করে দিতে পারেনি।

দুগ্‌গী ভাবলো কিছু একটা দরকার। জানানো দরকার। উঠে পড়লো। ভাগ্নার খোঁজ করলো। পাওয়া গেল না তাকে। ভাগ্নের বয়েসী প্রতিবেশী রতনের কাছে যেতেই রতন বললে 'আমার সময় নেই'। সে এ ব্যাপারে মাথা ঘামাবে না।

কুঠে ডিংরামীতে একজনের নাম আছে এ পাড়ায়। লোচনদাস তার ডাকনাম। লোচন দাস বললে ঃ দেখছি।

বেলা গড়াতে গড়াতে প্রতিবেশীরা অনেকেই এলো। দেখলো। সহানুভূতি জানালো। গোরাচাঁদ বলল 'রাতে জেগেছিলুম। তখন আমিও ঠিক ছিলুম নি। তাই বেরতে পারিনি।'

নরহরি বললে 'ছোড়াটাকে ঘা কতক না দিলেই নয়।'

প্রতিবেশীদের প্রত্যেকের মধ্যেই উৎকণ্ঠা আর বিরক্তি লক্ষ্য করে সাহস পেল দুগ্‌গী। ছোট মেয়ে সরী বললে 'বাবা ঐ বাতাটা দিয়ে আমাকে মেরেছে, দেখো না গা ফুলে গেছে'। কাঁদতে লাগলো বাচ্চাটা।

কমলী মেটেনী বললে 'হ্যাঁলো কি এমন হইছিল যে এত লণ্ডভণ্ড করলো'। সে যেন এই শুনলো।

দুগ্‌গী বললো 'মুখপোড়ার বিকার। আজ দেড়মাস কোথায় খাচ্ছে, কোথায় আছে জানি নি। ঘরে একটা পয়সা দেয়নি। এর ওর তার ঘরে ধান সিদ্ধ শুকনো মুড়ি ভেজে কাপড় কেচে পাট নিড়িয়ে নিজের পেট চালাই। মেয়ে তিনটের পেট চালাই। হঠাৎ কোথা থেকেন এসে বললে ডিস্‌টা দে। নেশায় বেতাল হয়েছিল।'

স্তব্ধ হয়ে শুনছিল অন্তত বার চোদ্দ জন মেয়ে-মদ্দ। যেন ওল্ গাছের বন। দেখাতে ঘন, কিন্তু মুরদ কম। 'কোঁচার খুঁট থেকে তিনটে ঝালবড়া না চপ বের করল পানিরাম। গামছার খুঁটে ছিল এক কাঁড়ি মুড়ি বাঁধা। কিছু না বলেই ডিসটা দিলুম। ডিসে ও মুড়িগুলো ঢাললো। চপগুলো ঢাললো। একটা বোতলের মদ ঢাললো মুড়িতে। মদে ভিজিয়ে বড় তৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছিল ও। এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারিনি। ঘেন্নায় বিরক্তিতে আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছিল। ছেলেদের বললুম তোরা শুয়ে পড়। ওরা শুয়ে পড়লো মেঝেতে। হাত বাড়িয়ে দেখালো। এপাশে বৌমা আর ঘতন শুয়েছিল। তারা ঘুমিয়েছিল কেউ কিছু বলেনি। ঘতন জেগেছিল।'

'আমি থাকতে না পেরে বললুম লজ্জাও নেই তোমার, চৌপর রাতে এতদিন পর এসে মদে মুড়ি ভিজিয়ে খাচ্ছো। আর এতগুলো পেট যে তোমার দিকে তাকিয়ে আছে কই তাদের খবর তো নাউনি'।

আর যায় কোথায়। চুমুক দিয়ে মুড়িগুলো খেলো। তারপর গালাগাল শুরু করে একটানা খেউড়ে করলে। খেউড় করতে করতে কাঁথা বিছিয়ে শুতে গেল। শুয়েও পড়লো। আমি উঠোনে থলেটা বিছিয়ে গা এলিয়ে দিয়েছি ততক্ষণে। ঘুম ধরেছিল হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই ওখান থেকে ও আমাকে ডাকলো 'দুগ্‌গী দুগ্‌গী।'

'প্রথমটা বুঝতে পারিনি। তারপর সাড়া দিলুম। কী।'

ও বললে 'এ রকম কি চলবে?'

আমি বললুম—তুমিই তো চালাচ্ছ।

ও ডাকলো আমাকে 'আয় কাছে আয়'।

আমার বড় ছেলে তখন জেগে আছে। সে গলা খাকারি দিল।

আমি বিরক্তিতেই বললুম 'না যাবনি।'

ও আবার ডাকলো 'দুগ্‌গি আয় কাছে আয়।'

'লোকটাকে ভালবাসি বলে আমার কি কুন রুচি নেই।' ঘেন্না নেই। কান্নায় ভেঙে পড়লো দুগ্‌গী। তারপর বললে ''যাবনা বলতেই বিছানা থেকে লাফিয়ে এসে আমার চুলো গোছা ধরে লাথি মারতে লাগলো। পলার শাঁখাটা ভেঙ্গে গেল। টালি ভাঙলো। চীৎকার চেঁচামেচিতে ঘতন ছুটে এলো। সে সামাল দিতে না পেরে তার বাপকে ঘাকতক দিয়ে চাগিয়ে দিলো।

''তারপর কখন সকাল হোল জানিনি। সে কোথায় তাও জানিনি। কিন্তু এখন কি করি।''

লোচন দাস ইতিমধ্যে দলবল নিয়ে এসে পানিরামকে একটা সাজার ব্যবস্থা করে ফেললো। ততক্ষণে পানিরামের নেশা গেছে ছুটে। কান ধরে উঠবোস করালো অনেকক্ষণ, যতক্ষণ না সে হাঁপাতে লাগলো, চোখে মুখে জল পড়ে গেল পানিরামের।

পানিরামকে পাওয়া গেছিল তেমাথায় মদের গলিতে। তখনও সে সকালের খাবার খায়নি। পিটুনীর এই একটা ব্যবস্থায় পানিরামকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা হয়।

দুগ্গীকে ভাল্ লাগছিল না বটে কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা থাকা দরকার। প্রতিবেশীরা সবাই ছিল, ঠিক হোল, পানিরাম মদ ছুঁবে না। দুগ্গী কারুর ঘরে কাজ করবে না। পানিরাম পাড়ার মধ্যে থাকবে কাজ করবে। পাড়ার মধ্যে কেউই তাকে হেঁড়ে মদ খাওয়াবে না।

বাতাস পরিশুদ্ধ হোল। কদিন ভালবাসায় টলমল করছিল ঘরখানি। টালি বসানো হলো। নিকানো হোল উঠোন। কাঁথাগুলো শুভ্র হোল। বাসন হোল মাজা। মেয়েরা বাবার পা টিপতে থাকলো সন্ধ্যায়। দুগ্গী একটা শান্তির সন্ধ্যা খুঁজে পেলো। এরকমই চলছিল কিছুদিন।

পাড়ার দু'চার ঘর তাড়ি হেঁড়ে মদ একটু বেশী খায়। এ পাড়ায় ওরা মস্ত দজ্জাল। কার শ্যালোর পাম্প চুরি করে এনে বিক্রী করেছে। মাঠের খাসী ছাগলের ঘাড় মটকে দিয়ে রাতভোর ফিস্টী খাওন করছে। ধানের জট্ কেটে এনে খোল করতাল কিনে হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ বলে ধেই নাচ করাই তাদের কাজ। তাদের না আছে রুচি, না আছে জীবন। কোনক্রমে বেঁচে গেলেই হোল। ব্যস।

হিন্দুধর্মটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে অনেকেই তা বুঝতে পারছে না। তার স্ববিরোধের মধ্যেই সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে চলেছে। শিব-শীতলা-ষষ্ঠী-লক্ষ্মী পুজোর সঙ্গে হিন্দুরা পুজো করে চলেছে গরু গাধা-বেড়াল-পেঁচা-ইঁদুর-সাপ-কচ্ছপ-শকুন কত কি? উত্তম মানুষ পুজো করছে ইতরের। শুধুমাত্র ব্যাঙ পুজো চালু ছিলনি। এটাও চালু হয়েছে অবৃষ্টিতে।

এ পাড়ায় মনসা পুজো হয় বেশ দম ভরে। সারারাত জেগে মনসা জাগরণ, মনসামঙ্গল হয়। পাড়া বেপাড়ার বৌ-ঝি-নাতিরা সবাই উদ্‌যোগ নিয়ে আসে। খিচুড়ি খাওন করে। মেগে পেতেই হয়। মনসার পুজোর পত্তন করেছে ওদের পাড়ার নগেন পাল। গলার স্বর কিনকিনে তার। বিদ্যে ক'অক্ষর গোমাংস। দুধ্ ঠুনকী, জল পড়া, ভূতধরা, গা বন্ধ, কত কি সামাজিক ব্যাধি নাকি নিরাময় করে সে। আহা তাকে যেন ভর করে আছে মহাকাল। সাপে কাটা রোগী হাসপাতালে না গিয়ে আসে তার কাছে। সে সাপে কাটা রোগীকে বাইরে রেখে চারজন আইবুড়ো মেয়েকে ঘরে ঢুকিয়ে খিস্তীমন্ত্র পাঠ করে। মেয়েরা যত খলখল করে হাসে রোগীর বিষ তত নামে। বাঁচাতো দূরের কথা লোকে মরে বেশী।

মন্ত্রের নামে যৌনাচার চলে পাড়ায় পাড়ায়। তলে তলে ব্যভিচার। অনাচার নৈতিক অধঃপতন। দুগ্গীকে এসব ভাল লাগেনি। নগেন পাল তাকে কতবার ছেলেবন্ধ হবার প্রস্তাব দিয়ে ওষুধ দিতে চেয়েছে, সে রাজী হয়নি। মহিলা সমিতির মেয়েরা তাকে জোর করে অপারেশন করিয়ে এনেছিল সেবার।

মনসা পুজোর নাম করে একটু বেশী দাপাদাপি করে এখানে। বুড়োর ভাঙালে মদ চুয়ানো হয়। মনসাতলায় যে পাঁঠা পড়ে সে পাঁঠার ঠ্যাং রান্না হয় মদের জন্যে। তাই রাত আটটায় পাঁঠাবলির বিধান দেয় ভটচাজ্যি।

কতকগুলো জোয়ান ছেলে আর্য সমাজকে ধরে এনে বেদ প্রচার করতে নেমে তর্ক বেঁধেছে ভটচায্যির সঙ্গে। ভট্চায্যি বলেছে পাঁঠাবলি বেদেরই বিধান আছে। তারা তর্ক ছুঁড়েছে কিন্তু বলি বন্ধ হয়নি। তাদের মতবাদে যুক্তি দিয়েছে ঃ 'তোমার উৎসব তুমি খাবে খাও কিন্তু মিথ্যে কথা বলছো কেন?'

মনসার কত্তারা রেগে আগুন এতে। কার রাগে কার কি বয়ে যায়। পুজো হয়, পুজোয় শুধু মুখ্যুরা যে আসে তা নয়, মাস মাইনের সরকারী কর্মচারী, মাস্টার মশাই, পঞ্চায়েত, গ্রামের ভি. আই. পি বাবুরাসহ চাষী, কৈবর্ত্য, জেলে, বামুন, বাগদী, মাহিষ্য সবাই আসে। দু'একজন মুসলমানও আসে। মুসলমানদের দেখে মনসাপূজার কর্তাদের ভালো লাগে। তারা প্রচার করে বলে 'মনসা ঠাকুর জ্যান্ত ভগবান, দেখ যারা শুধু আল্লা মানে তারা মা মনসাকেও কেমন ভয় করে।'

দুগ্‌গী এম. এল. এ. মামার বক্তৃতা অনেকবার শুনেছে। তার মামা বলতো 'মানুষের চেয়ে বড় কেউ নেই'। তার কাছ থেকেই সে শিখেছিল 'পুজো বড় নয়, মানুষ বড়।' তার আত্মসম্মানে লাগতো মানুষ যতো ন্যাংট মত্ত হয়ে পড়ে পুজোয় ততো বেশী দাপাদাপি করে।

দুগ্‌গীকে পছন্দ নগেন পালেরও। পুজোয় যাবে না বলতে নগেনের রাগ হয়। সবাই ভালবাসে বলেই দুগ্‌গীর ভাঙা সংসার জোড়া লাগিয়ে দিয়েছে। লোচন দাস নিজেও দুগ্‌গীর উপর দুর্বল। নারীও তো ব্যক্তি। সে সংসারী মানুষ। হাসিঠাট্টা মজা করে সে ক'জনের মনোরঞ্জন করবে। সে যদি বিলাসিনী হোত তাহলে সে নিশ্চয়ই চেষ্টা করত। দুগ্‌গী নিজে তো তা নয়, তবে সে এগুলো ভাববে কেন? ভাববার তো দরকারই তার নেই। কিন্তু লোচন দাস তাকে আকাঙ্খা করে; দুগ্‌গী একটু হাসুক, গল্প করুক, একটু মজা করুক তার সঙ্গে। লোচন দাস দুগ্‌গী সম্পর্কে এসব ভাবলেও সে বলতে পারে না। তার ইচ্ছে দুগ্‌গী একবার বলুক তাহলে পানিরামকে একেবারে টিট্ করে দেবে। সব বাড়াবাড়ি বন্ধ করে দেবে তার।

পাড়ার লোকেরাও চটে গেছিলো তার উপর, কেননা সে মনসা পুজোয় চাঁদা দেবে না বলে না। সেবার পাড়ার যে ছেলেদের খাসী চুরির দেখা ঘটনাটা দুগ্‌গী বলে দিয়েছিলো বলে তার উপর আরো একটু হাড়ে চটা। পাড়ার লোকের সাহায্য দরকার তার বেহেড স্বামীকে ধাতে আনার জন্যে অথচ পাড়ার অন্য কাজে সে সহযোগিতা করবে না এটা স্ববিরোধ বলেই মনে হয়েছে পাড়ার। খুব স্বাভাবিক কারণেই দুগ্‌গীর উপর রাগ হোল তাদের। 'আচ্ছা দেখা যাবে।'

দুগ্‌গী এত অঙ্ক মেলাতে পারে না। সে সরল সাদা ব্যাপারটুকু বুঝে। বাকী বুঝবার চেষ্টাও করে না।

দশহরার রাত একটা আলাদা রাত। এই রাতের পুজোর পরে গুণিনেরা ধরা সাপগুলো মাঠে ছেড়ে দেয়। এই দিন সাপ কারো নজরে এলেও লোকেরা প্রায় মারে না। সাপের পুজোয় হয় মনসার গান। জ্যান্ত ভগবানের পুজো। ভক্তিভরে বলে 'জ্যান্ত যম'। মনসার থানে মাইক বাজছে। একদলের নাচ চলছে সন্ধ্যা থেকে। যে ক্লান্ত হচ্ছে সে জিরিয়ে নিচ্ছে। নতুন লোক আসছে। 'মনসা মাকে খুশী করার জন্যে নাচ নয়, নাচ নিজের খুশী হওয়ার জন্যে।

সেই সন্ধ্যা থেকে পানিরামকে নিয়ে আসর বসেছে বড় পুকুরের পাড়ের চালায়। এই চালায় পাটকাঠি, তিলের আঁটি গোছ করা থাকে। এরই পাশে পাড়ার বয়স্করা বসেছে খানিকটা মাংস আর ব্লাডার ভর্তি চুল্লু নিয়ে। চুমুক দিয়ে চলছে ধীরে ধীরে, লোচন দাসও তার গলা ভিজিয়ে নিয়েছে। মাংসতো নয়, মুরগীর দোকানের ছাঁট নিয়ে তৈরী হয়েছে চাঁট। এতে মুরগীর নখ বাদ দিয়ে পা আছে, নাড়ী ভুড়ি আছে, ছাল আছে। মূল মাংসের বর্জ নিয়ে ছাটের চাঁট।

জ্যোৎস্না প্রায় ডুবু ডুবু। লোচন দাস কখন উঠে গেল খেয়াল করেনি কেউ। এপাশে ঝিঙা চিচিঙ্গার মাচার ছায়ায় আবছা অন্ধকার। ভাঙ্গা গোটাকতক ধান সেদ্দর হাঁড়ি, ছেঁড়া নুড়ি গামছা না কি ঝুলছিল একটা বাঁশের দড়ায়। মাচার পাশেই হরি বুড়োর ঘর। সে মালা নাচায় প্রতি প্রহর অন্তর। ঘুম নেই তাই জেগে থাকে। আর কাশে একটু বেশী। কলা গাছের খোল পড়েছিল ছড়ানো হয়ে উঠোনে। লোচন দাসের পা পড়তে লাগলো ছড়ানো কলা খোলের উপর। মচ্ মচ্ শব্দ হতেই ও ঘরের বুড়োর মনে হোল কোন কুত্তা উঠবার চেষ্টা করছে? সে কোন রকমের দেখার চেষ্টা না করেই বললো, 'বেরো, ধূর হ ধূর হ' কোন সাড়া শব্দ না পেয়েই বুড়ো চুপ করে গেল।

লোচন দাস চোরের মত অতি সন্তর্পণে উঠে এলো দাওয়ায়। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল কেননা মনসা পুজোয় কেউ না কেউ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিল। তবুও লোচন দাস দরজায় টোকা দিয়ে হ্রস্বস্বরে বললো 'পানি'। টোকা শুনে সন্দেহ হোল দুগ্‌গীর। সে আবার সাগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলো। অপেক্ষার আগেই পুন পুন টোকা পড়তে থাকলো। আর মিহি সুরে ডাকলো 'পানি ও পানি'।

দুগ্‌গীর মনে কোন পাপ ছিল না। কারো প্রতি আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। সে জানতো পাড়ার সবার কাছে সাহায্য চাইতে হয় বলেই তার কোন কলঙ্ক থাকা চলবে না। সে একটু ভয় পেলো, কে তাকে এত রাতে ডাকতে পারে?

'পানি!'

দুগ্‌গী জিগোস করলে 'কে?'

তেমনি করে গলা নামিয়েই বললো সে 'আমি তোর দাবাবু'।

দুগ্‌গী স্বাভাবিক জোরের গলাতেই দরজা খুলতে খুলতে বললে 'দাবাবু তুমি এত রাতে কেন গো?' ঘর থেকে দড়ি বাঁধা লণ্ঠনটা নিয়ে বেরিয়ে এলো। বাড়ীতে আর কেউই নেই, সব পুজোয় গেছে তারা। —এত রাতে দাবাবু। তুমি তো ডাকলেই আমি তোমার কাছে যেতুম। কষ্ট করে এলে কেন? ভয়ে আগ্রহে বলতে থাকলো সে। লোচন দাসের ঝিমুনি নেশা ছিল। কিন্তু নেশাগ্রস্ত ছিল না। সে হঠাৎ দুগ্‌গীর চীৎকার কমাবার উদ্দেশ্যে দুগ্‌গীর মুখ চাপতে চেয়ে বললো 'চুপ কর, ঘরে ঢোক।'

হঠাৎ দুগ্‌গীর বুক ধড়পড় করে উঠতেই চীৎকার করে বললো। 'ও দাবাবু গো কেন গো?' যেন কেঁদে ফেলবে সে।

হরিবুড়ো এইসব শুনে জানলার পাল্লা খুলে জিগ্যেস করে বললে 'দুগ্‌গী অ কে রা? কি হইচে।'

দুগ্‌গী বললো, 'কেউ না, দাস দাবাবু।'

লোচন দাস একটু ভয় পেয়ে গেল। সে ঘাবড়ে গিয়ে প্রায় দাব্‌ড়ে বললে, 'অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন? পানিরামের খোঁজ করছি তো।'

—'এত রাতে কেন দাবাবু? কোন কিছু হয়নি তো তার?' প্রায় কেঁদে ফেললো সে 'হায় কি হোল গো?'

কিছু ঘটে যাবার ভয়েই লোচন দাস ভাবলো 'মনে মনে কেটে পড়াই ভাল।' ইচ্ছেকে দমন করে সে দ্রুত চলে গেল। কি ভাবল যেন দুগ্‌গী, কিছুক্ষণ দাওয়ায় বসে রইলো, তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে হুড়কোটা ঢুকিয়ে দিলো। লণ্ঠনের দমটা কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো মাদুরটায়। লোচন দাসের কথা ভেবে দুগ্‌গী বুঝি হাসতে হাসতে চোখ বন্ধ করলো।

পরের দিন যখন নেশা কাটলো তখন প্রায় অনেক বেলা। গতরাতে লোচন দাসের কথা শুনে ক্ষেপে যাবার মতো রেগে গেল সে। সে লোচন দাসের ঘর গিয়ে খিস্তী দিয়ে এলো 'শালা তুমি জাননি একসঙ্গে মদ খাচ্ছি, তবুও শালা অত রাতে আমার বউয়ের কাছে আমাকে খুঁজতে যাওয়া হইচে'। তারপর পানিরাম আবার বিগড়ে গেল। কাজ করল না। মদ খেতে থাকল। ছেঁড়া চাদর বিক্রী করল। চটি জুতো বিক্রী করলো। গামছা বন্ধক দিয়ে মদ খেলো। পানিরামকে মদ থেকে উঠানো গেলো না। অবসাদে আচ্ছন্ন দুগ্‌গীর কোনক্রমে দিন কাটত। দুগ্‌গী যেন ক্লান্ত অবসন্ন।

জনা চার লোক দু'টো করাত নিয়ে পানিরামের কদম গাছের তলায় এসে হাজির। কাউকে কিছু না বলেই করাতে ধার দিতে থাকলো তারা। তাদের একজন বড় একটা কাটারি নিয়ে কদম গাছের উপর উঠে ডালপালাগুলো কাটতে শুরু করে দিলো সক্কালবেলায়।

দুগ্‌গী দেখে চমকে গেল। কি ব্যাপার। সে সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে গেল 'হ্যাগা, কে গুরবেটারা আমার গাছে চড়ে গাছ কাটছু র‍্যা? হ্যাগা, কে তোমরা। বাপের গাছ পেয়ে গাছ কাটছ। হাতের কাছে হরি বুড়োদের পাতকাটি ছিল সেই ধারাল পাতকাটিটা নিয়ে তেড়ে গেল সে, নাম ওলাউঠো, জ্বালাতে এয়েছো। লজ্জা করেনি। বলা নেই কওয়া নেই গাছ কাটতে এসেছো। অবাগীর ছেলেদের বাপের গাছ পেইছে রে' বলেই সে চীৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকতে থাকে 'বাঁচাও গো ডাকাত ডাকাত'।

সকালে 'ডাকাত' এই চিৎকারে কেউ কেউ ছুটে এলো দুগ্‌গীর ঘর। কোন কিছু বুঝবার আগেই ডাকাত কোথা জানতে চাইলো তারা। আর কিছু না হোক 'শালা ডাকাতের জ্যান্ত ছাদ্দ' করে দেবে তারা।

দুগ্‌গী রীতিমতো ঝগড়ার ভঙ্গীতে, যেন ঝাঁটা মেরে ভূত খেদাবে, বললো এই তো এরা ডাকাত, আমার সর্বনাশ করছে। দ্যাখো না, 'বলা নেই কওয়া নেই আমার গাছ লুঠ করছে ওলাউঠোরা।' আরো খেউড় করে গাল করতে থাকলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় লোকগুলো স্তম্ভিত হয়ে গেল। যুবক লোকটি গাছ থেকে নেমে পড়েছে আগেই। কিছু বলবার আগেই বয়স্ক লোকটি উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে মিনতি করে বললো 'আমার কোন দোষ নেই। আমি ওদের মজুর।' লোকগুলি জানালো 'পানিরাম আমাদেরকে পঁচাত্তর টাকায় বিক্রী করেছে।' যে গাছটা সাড়ে চারশ টাকায় বিক্রী হওয়া উচিত সেটা বিক্রী হয়েছে মাত্র এই টাকায় শুনে ঘাবড়ে গেল লোকজন। লোচন দাস, নগেন পাল এরা সবাই এসে হাজির হয়েছে ইতিমধ্যে।

কলেজ পড়ুয়া যুবক রতন রাগ নিয়েই জিগেস করেছিল। একজন বললে 'আমরা টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে কিনেছি'।

—আপনি জানেন সে মাতাল, তার কাছ থেকে গাছ কিনলেন কেন?

—সে মালিক তাই কিনেছি। মাতাল হলে কি সম্পত্তির অধিকার চলে যায়?

—না যায় না, কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব আপনার নেই? জানেন, ওর সংসারটা চলে কেমন করে?

দুগ্‌গী হঠাৎ মুখ খারাপ করে বলে উঠলো 'ওই বোনমেগেরা কি করে বুঝবে, আমি কি করে সংসার চালাই।'

কে একজন টিপ্পনী কেটে দুগ্‌গীকে বললো, 'তুমি ভাল হোলে কি সে মাতাল হোত?'

—ওলাউঠোরা আমার দোষটাই দেখে। তার দোষ কি দেখতে পায়।

রতন ধমক দিল দুগ্‌গীকে। 'থামো।' দুগ্‌গী বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো 'আমি কি করে থামি গো। আমার যে কিছু নেই। আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে গাছটা সাউথে রেখেছি গো। আমি কি করে বিয়ে দুব গো ওই ওলাউঠোদের মনসাপুজোই আমার কাল হইচে গো।'

রতন আরো ধমক দিয়ে উঠে 'থামবে না কি?'

যারা উপস্থিত ছিল তাদের সবার সঙ্গে আলোচনা করে নিল রতন। তারপর সে দৃঢ় ভাবেই বলল 'ওদের করাতগুলো আটকাও, ওদের ছেড়ে দাও। যে বিক্রী করেছে সে আসুক। পরে বসে ফয়সালা হবে'।

লোকগুলো বললো 'করাত আটকাওনি বাপ, তোমরা যা করবার তাই কর, গরীব মানুষ খাটলে খেতে পাব আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, মরে যাব।'

রতনের এতটুকু মায়া হোল না। বরং দৃঢ়তার সঙ্গে বললো 'আগে মরলে ভাল হোত, আজকের এই ঘটনা ঘটতো না।' কেউ রা কাটলো না রতনের বিরুদ্ধে। দুগ্‌গী করাতগুলো টেনে নিয়ে ঘর ঢুকালো। লোকগুলো বললো, 'তোর বাপ-মাকে গড় করি আমাদের করাতগুলো ফেরত দে? অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।'

রতন কদম গাছের দিকে তাকিয়ে কত কি ভাবল। হয়তো বা এই গাছটাই দুগ্‌গীদের বহুভাবে আশ্রয় দেবে। পাড়ার লোকদের উপর তেমন কোন আস্থা নেই দুগ্‌গীর। কিন্তু রতনের কথায় যেন সাহস পেলো সে। সে রতনকে বললো, 'না ভাগ্না একবারও মত দিউনি গো।' রতন একবার লোচন দাস, একবার নগেন পাল, একবার অন্যদের তাকিয়ে নির্দিষ্টভাবে বললো 'না' পাবে না'।

রিপু

—'প্লিজ! এই শীটটায় বসবেন না, স্যর বসবেন।'

শান্ত বিনয়ি ও মধুরভাষীণী অণিমার 'স্যার' কথা শুনেই লোকটি চমকে গেল। কিন্তু কোন পাত্তা না দিয়েই তার পাশের রুমাল রাখা খালি জায়গাটা দখল নেবার জন্য টেকারের শীটে বসে পড়ল।

একটু রাগ করেই অণিমা বললো, 'বলছি তো স্যর বসবেন। শীটটা তার জন্যেই রাখা, শুনতে পাচ্ছেন না?'

লোকটি বিরক্ত হয়ে বললে, 'কে স্যর। কোথায় সে।'

লোকটির তাচ্ছিল্যের কথা শুনে বিরক্ত হোল অণিমা। 'অণিমা মাষ্টার'। তাকে সবাই অণিমা মাষ্টার বলেই চেনে। লোকটিও তাকে চেনে কিন্তু গুরুত্ব দেয় না কোন দিনই। প্রায় সমবয়সী লোকটির কথা শুনে অণিমা বলে, 'তিনি এখনো আসেননি।'

'তিনি না এসেই তার শীট দখল। এযে রামের জন্মের আগে রামায়ণের মতো। ধূর মশাই ছাড়ুন। আগে এসেছি শীট চাই।' লোকটি বলে।

—'এমন বলছেন কেন?'

—'বলব না মানে! কোথা কোন হরিদাস আপনার স্যর তো আমার কি। অতবড় স্যর যখন, রিজার্ভ করলেই পারেন। ছাড়ুন, ছাড়ুন।' একটু জোর করেই দখল নিতে চায় সে।

অণিমা খুব শান্ত ও সংযতভাবেই বলে 'দেখুন! তাকে চেনেন। তিনি বুড়ো মানুষ। খাঁপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার। আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন।'

'আচ্ছা মুসকিল তো ভাই। তিনি তো পঙ্গু প্রতিবন্ধী অসুস্থ নন। লোকটাকে সবাই চেনে। পাজীর পা-ঝাড়া তার জন্যে শীট ছেড়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' অবলীলায় বললো লোকটি।

'একজন মাষ্টার মশাই সম্পর্কে এটা বলা কি ঠিক হচ্ছে?' অণিমা বলে।

'বেতন তো কম পাননি, তবে গরীবের শীট নিয়ে অত কাড়াকাড়ি কেন। একটা ট্যাক্সি নিলেই তো দাঁতে খাঁচি দিয়ে ঘুমোতে ঘুমোতে যাওয়া হয়। ধ্যাৎ ওসবে চলবে না।' 'ফালতু বলবেন না। এ শীট হবে না, আপনার যা ইচ্ছে করুন।' অণিমা কড়াভাবে বলে।

অণিমা অত্যন্ত মার্জিত। হালকা ছাপা শাড়ী। সম্পূর্ণ গা ঢাকা। টিকলো নাক। পিঠ ভর্তি চুল বিনুনী করে বাঁধা। বাঁ হাতে ছোট্ট একটা ঘড়ি। পায়ে একটা সাধারণ চটি। কখনো একটা বাটার স্যান্ডেল, এই তার প্রতিদিনের রুটিন। শহর থেকে দল বেঁধে মাষ্টারেরা গাঁয়ে যায় মাষ্টারি করতে। এরা কেউ দূরের। এরা কেউ কাছের। কেউ বাড়ী

থেকে পালিয়ে শহরে এসেছে, কেউ দূর থেকে এসে শহরে থেকেছে। এরা এখন তালে থাকার দল। গাঁয়ের গরীবদের পড়ায়। তাদের পড়িয়ে সরকারী মাইনে পায়। কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকলে 'শ্রেণী' যাবে তাই তারা গাঁয়ে না থেকে শহরে আসে। এরা এখন বর্ণচোরা অনেকেই। কিন্তু অণিমা এরকম নয়।

তার বাবা মারা যাবার পর 'ডায়েড ইন্ হারনেসে'র সুযোগে খাঁপুর হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ভবতারণবাবু তাকে চাকরী করে দিয়েছেন। দুঃসহের দিন ছিল তাদের ছোট বেলা। অভাবে অনটনে এক বেলা আধ বেলায় তাদের প্রহর কাটতো। ভবতারণবাবু তাদের পরিবারকে এই দুর্বিষহ যাতনা থেকে মুক্তির সুযোগ 'দিয়েছেন'। সুবিধা হয়তো পেতো, কিন্তু তা যদি আরো দেরী হোত তবে দিনান্তের কষ্টের পরিমাপ করা যেতো না। তাই ভবতারণবাবুকে অণিমা 'ত্রাতা' বলে মানে। তাকে অশেষ শ্রদ্ধা করে। 'তিনি বাবার বন্ধু শুধু নয়, তিনি বাবার মতো শ্রদ্ধেয়'। তাই লোকটির সম্পর্কে যা-তা কথায় রেগে যায় অণিমা।

—'আপনিও তো ট্যাকসি নিতে পারেন। বারণ করেছি আপনাকে।'

—'ধূর ধূর যত্ত সব জালি।' গজ গজ করতে থাকে লোকটি।

আরো রেগে যায় অণিমা। প্রায় কলার ধরার উপক্রম করে বলে, 'জালি বললেন কেন? ইয়ার্কি পেয়েছেন।' উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে সে।

'জালিকে জালি বলবো, আপত্তি কেন আপনার হ'স,' লোকটি সাহসের সঙ্গে আরো বলে।

—'না পারেন না। মুখে যা আসবে তা বলতে পারেন নাকি?' আক্রোশে ফেটে পড়ে অণিমা।

'ওকে জালি বললে আপনার হিং লাগে কেন?'

'হিঙ' বলতেই নিজেকে সংযত করে অণিমা। কেননা 'হিঙ' কথাটায় খুবই অশ্লীল প্রয়োগ এই অঞ্চলে চালু আছে। তবুও রাগে আরো মাথা গরম হয়ে যায়। কী একটা বলতে যাবে এমন সময় সহযাত্রীরা নাকগলায়; বলে 'দিদিভাই তর্ক বন্ধ করুন।'

—'তর্ক কি আমাকেই করতে দেখছেন?'

—'না দেখছি না। কিন্তু ওর কথাও একবার ভাবুন। উনি তো আগেই এসেছেন অথচ এসে দেখছেন রুমাল দিয়ে ঘেরা। যার জন্য ঘেরা তিনি এখনও বেপাত্তা। ধরুন, আপনার, বেলাতেও একই ঘটনা ঘটলো, রুমাল বা অন্য কিছু দিয়ে কেউ শীট রেখেছে। অথচ অনেক আগেই পৌঁছেছেন আপনি। আপনি কি এই 'কথাগুলোই তাকে বলবেন না? না কি বসবার চেষ্টা করবেন না?'

রাগে একটু জল ঢেলে দিল বোধ হয় কেউ। একটু শান্ত হোল অণিমা। তবুও বললো 'যত্তো সব।'

দ্বিতীয় লোকটির হস্তক্ষেপে অগত্যা প্রথম লোকটিও একটু শান্ত হলো। কিন্তু সে রাগে দাঁড়িয়ে রইলো টেকারের নীচে।

একটা লাল গামছা ও কন্ট্রাকটরি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে টেকারের লোক চিৎকার করে ডাকতে লাগলো রাণীপুর। রাণীপুর। ভায়া খাঁপুর, চাতাল বড়তলা। দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যে জনা তিরিশেক লোক এসে হাজির হোল। বসবার দাঁড়াবার চেষ্টা করে যেতে থাকলো তারা।

এরকমই কোন মুহূর্তে এসে হাজির হলেন বৃদ্ধ ভবতারণবাবু। সাদা কাপড় পাঞ্জাবী পরেছেন। চোখে হেভী লেন্সের চশমা। হাতে একটা ছাতা। ছাতাটি রাখেন তিনি। তিনি হাজির হতেই ফিস্‌ফাস্ করে দু'একজন বললে 'এই তো এসে গেছেন।'

তিন চার দিন দাড়ি কাটা হয়নি ভবতারণবাবুর। বেশ গোল-গাল চেহারা তার। চশমার বেশী পাওয়ারের জন্য তিনি উটের মতো মুখ তুলে বলেন, 'কোথারে অনি, জাগা রেখেচু না কি?'

অণিমার মনটা এমনিতেই খারাপ। তবুও ভবতারণবাবুকে দেখে একটু খুশী মনে বললে, 'আসুন স্যর শীট আছে।' যারা শীট পায়নি স্বাভাবিক কারণেই তারা রাগী, তারাও কৌতূহলী হয়ে তাকালো ভবতারণবাবুর দিকে।

শীটে বসতে বসতে বললো 'একটা বড় শোল মাছ কিনে ছিলুম। রাঁধতে দেরী হোল তাই খেতেও দেরী।' দাঁতে কী একটা টুকরো লেগে আছে মনে হোল। জিভের সাহায্যে সেই অংশটা বের করবার চেষ্টায় মুখে একটা বিশ্রী শব্দ করছিলেন তিনি। এরই মধ্যে তিনি একটি নির্দিষ্ট শীটে গিয়ে বসলেন।

অণিমার পাশে বসবার পরই একটু বেমানানভাবে ভাল করে নিরীক্ষণ করলেন অণিমার চেহারাটা। তার বুক তার পেট, তার মুখ তার পেছন থেকে আপাদমস্তক দেখে বললেন, 'অণি তুই যেন আজকে ষোড়শী তন্বী। তুই তো দারুন সেজেচু।' লজ্জাবতী গাছে স্পর্শ লাগলেই যেমন মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয় ঠিক তেমন করেই অণিমা মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করল। একেই তার মেজাজ খাট্টা হয়েছিল, তার উপর যাকে বাবার মতো দেখে তার মুখ থেকে এত লোকের মাঝখানে এরকম কথাবার্তা শুনে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে করলো। সে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো 'আপনি থামুন তো।' রাগে গজ গজ করতে থাকলো।

ভবতারণবাবু বললে 'বাব্বা রাগচু কেনে, একটু ঠাট্টা করলুম তো।' ধূপের খাঁচিতে দাঁত খোটাতে খোটাতে অবলীলায় বলতে থাকলো 'তোর মাসীমার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হোল। কী করা যাবে।'

যারা আগের ঘটনার শুনে ছিল তারাও যেন বিরক্ত হোল। ভবতারণবাবুর আচরণে বিরক্ত হয়ে সেই প্রথম লোকটি গজ গজ করে বললো 'শালা! জালিকে জালি বললে আবার দোষ!'

অণিমার ইচ্ছে হচ্ছিল 'কিছু বলি' কিন্তু সে কিছুই বলল না। মুখ গম্ভীর করে বাকী রাস্তা চলতে থাকলো। সমবয়সী যাত্রীরা সুন্দরী অণিমার একবার ঠোঁটের দিকে একবার বুকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। অণিমা এসবে খেয়াল করল না।

টেকার দ্রুত বেরিয়ে গেল রাণীপুরের দিকে।

বাড়ী ফিরে অণিমা মুখ হাতে জল দিয়ে একটু চা খেলো। মাকে বললো 'মা একটু আসছি মুড়ি খাব।' বলেই সে সদর বারান্দার কোণের ঘরটায় ঢুকলো। এ ঘরেই অণিমার সব। তার বইপত্তর কাপড়চোপড় সাজ-গোছ। এখানেই তার প্রেম অপ্রেম আনন্দ বেদনা সব। এই সব নিয়েই সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। দৈনিক দাঁড়ায়। এই আয়নার সামনে সে তার স্বামীকে নিয়েও দাঁড়াতো একা। তখন তার নিজেকে মনে হোত নক্ষত্রলোকের পরীর মতো। সে দুয়ার বন্ধ করে যখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শরীরের সবটা আয়নার সামনে খুঁটিয়ে দেখতো তখন মনে হোত সে যেন কোন আশ্চর্য রমণী। সে কখনো জীবন্ত পুরুষের প্রাপ্ত বয়সের চেহারা বিয়ের আগে দেখেনি। বিয়ের পর প্রথম রাত্রিতে তার স্বামীকে সম্পূর্ণ নগ্ন দেখেছিল। সে এক আশ্চর্য রাত। সেরকমভাবে বহুবার তারা এই আয়নার সামনে দাঁড়াতো' এখনো দাঁড়ায় তাকে নিয়ে। এখানে দাঁড়ালে তার স্বামী তাকে অদ্ভুতভাবে আদর করে। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে অণিমা। আজ তার সত্যিই মনটা খারাপ। সকালে সবার সামনে তাকে তার হেডমাষ্টার যিনি বাবার সহকর্মী ছিলেন এবং প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়েস, সরকারীভাবে আটান্ন; তিনি কেন 'ষোড়শী তন্বী' বলে ঠাট্টা করলেন সেকথা বুঝতে পারলো না। সত্যিই কি সে ষোড়শী তন্বী। তার বয়েস এখন বত্রিশ। বত্রিশের সাহসিনী সে। কথাটার সৌন্দর্য আছে। কিন্তু এই কথাটা যদি তার সমবয়সী বন্ধুরা বলে তবে কোন অন্যায় নেই কিন্তু তার দ্বিগুণ বয়েসের বৃদ্ধ পুরুষ যখন বলেন তখন তার খারাপ লাগেই। বৃদ্ধ যদি দাদু হতেন আপত্তি ছিল না কিন্তু তিনি বাবা পিতৃপ্রতিম। তবে তিনি কেন বলবেন।

নিজের দোষ কোথায় তার। ঠোঁট, জিভ, নাক, চোখ, ভুরু, জুলপি, গালের তিল, চুল একে একে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বুক থেকে আঁচল খসিয়ে দিল। তারপর একে একে বিবসনা অণিমা একা সেই বৃহৎ আয়নার সামনে তির্যকভাবে দেখতে থাকলো নিজেকে। ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ। মেঘ রঙের আলো জ্বলছিল অণিমার ঘরে। সেই আলো আঁধারির মায়ায় অণিমা তার বৃহৎ দেহকে আরো ভাল করে দেখছিল। তার ছাতির গড়ন, তার কোমর, নিতম্ব, জানু, বাহু, বাহুমূল, নাভি, নাভিকুণ্ড, নাভিকুণ্ডের নীচের ভাঁজে একটু মেদ, একটু মেদ নিয়ে তার শরীর যেন মায়াবিনী। অণিমা অন্যায় খুঁজে তার শরীরে, কি অন্যায়, কেন অন্যায়। 'আমার দোষ কোথায়' দোষ খুঁজতে খুঁজতে মন খারাপ হয়ে যায়। কোন অন্যায় কোন পাপ সে খুঁজে পায়নি তার শরীরে। সমবয়সী বন্ধুরা তার দিকে তাকিয়ে গিলতে থাকলে সে নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয়, আরো ঢাকে। যত ঢাকে ততই লাবণ্য যেন ফুটে উঠে তার শরীর জুড়ে। তার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় হেড মাষ্টারের কথায়। ঘৃণা জন্মায় তার মনে।

সমস্ত কাপড়-চোপড়ে আবার ঢেকে নেয় বিবসনা অণিমা। তারপর যেন ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে খাটের উপর।

দরজার খটখট শব্দে তার ঘুম ভাঙলো যখন তখন ঘড়িতে ন'টা। রাত ন'টা। দরজার বাইরে থেকে ডাকে, 'অণিমা—' স্বামী অরুণাভর গলা বুঝতে দ্রুত দরজা খুলে, জড়িয়ে ধরে তাকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অণিমা, 'অরুণাভ আমার কি অন্যায় বলো, আমার কি অন্যায়।'

খাঁপুর হাইস্কুলের কমনরুমটি এমনিতেই অপরিসর ছিল। যতজন স্টাফ ততজনের কোনক্রমে বসবার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ইদানীং ক'বছর হোল শিক্ষক নিয়োগ করে মাথাপিছু দেড় দু'লক্ষ করে টাকা নিয়ে, বোম্বে-দিল্লী-আমেদাবাদ ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করা টাকায় একতলা বিল্ডিং এখন তিনতলা। এখন বিশাল বিদ্যালয় ভবন। বেশ খোলামেলা শ্রেণী কক্ষগুলি। শিক্ষকদের কমনরুমের মেঝে পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে বিদ্যাসাগর -ক্ষুদিরাম-মালক্ষ্মী, কালী, দূর্গার সঙ্গে ইন্দিরা, মহাত্মা ইদানীং জ্যোতি বোস অটলবিহারীর মুর্তি শোভিত হয়েছে। বাদ যায়নি অবশ্যই রাজীবের মুখ।

দুঃখের কথা মাকড়সার ফাঁদে ভর্তি ছবিগুলিতে। শুধু অফিসকক্ষই নয় সমস্ত ক্লাস রুমের দেওয়াল জুড়ে একই অবস্থা। যেন পরিষ্কার লোক নেই। কমনরুমে কান পাতলে কোন ব্যাকরণ সমস্যা শোনা যায় না। ক্লাসের ভাল ছেলের প্রশ্নে কোন আলোচনা হয় না, আধুনিক শিক্ষার প্যাঁচ পয়জার সহ আইনী বেআইনী কোন ক্রিয়েটিভ কিছু আলোচনা হয় না। দু'জন থাকলে আলোচনা ঘর-সংসার, তিনজন থাকলে আলোচনা হয় ডি-এ বেড়ে কত হোল। আর বেশী থাকলে আলোচনা হয় কার কত শেয়ার লস হয়েছে, আলু ব্যবসায় কত গেল, বীমা ব্যবসায় কতগুলো হেড বাকী, পিয়ারলেসে ইউনিটে লাভ আছে কিনা এইসব।

রাজ্যের সমস্ত মানুষের মুখে পাঁশ পাছুড়ে দিয়ে বিপ্লবী সরকার তার বিপ্লবী কর্মচারীদের বাঁচাবার জন্য বাছুর মেরে সমস্ত দুধটুকু দিয়ে দিচ্ছে, অথচ সেই কর্মচারীরা কাজ করে না, ঘুষ নেয়, ফাঁকি দেয় সামাজিক হয় না। সরকারী কর্মশালা যেন গোশালায় রূপান্তর হয়ে চলেছে। যারা কাজ চায় কাজ করে তারা এদের সঙ্গে বেমানান, যেন সিডিউল কাস্ট। একঘরে। খাঁপুর হাইস্কুলের কমনরুমে কোন দিন ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠের মান উন্নয়নের জন্য ভাবা হয় না, অমর্ত্য আলোচনা হয় না। নতুন কোন সাময়িক পত্র নেবার ব্যবস্থা নেই। খবরের কাগজ চোখ বুলাবার আগে 'আজকের দিনটি' প্রথমে দেখা চাই-ই চাই।

কাঁহাতক অসভ্য হয়ে উঠছে যেন মাষ্টারেরা। পরীক্ষার খাতা নিজেরা না দেখে লোক দিয়ে দেখায়। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় উত্তর পত্রের বাড়তি সাদা কাগজ কেটে নেয় বাড়ীর ছেলেরা অঙ্ক কষবে বলে। ভয়ঙ্কর হীনমন্যতায় হীন হয়ে পড়ছে বেশীরভাগ শিক্ষক।

অণিমার এসব ভাল লাগে না। পছন্দ নয় তার। শিক্ষকতার পেশা তো সৌভাগ্যের পেশা। আগে মাষ্টাররা ইজ্জত পেতো, পয়সা পেতো না। এখন পয়সা আছে, ইজ্জত দেয় না মানুষ। কেন দেবে? অধিকাংশ জনই এরকম।

যেদিন বিশ্বসুন্দরীর প্রসঙ্গ নিয়ে রগরগে আলোচনা হচ্ছিল সেদিন অণিমা মাষ্টার প্রতিবাদ করে বলেছিল, 'আপনারা হাজার হাজার টাকা বেতন নেন অথচ পেশা নিয়ে ভাবেন না, আপনাদের লজ্জা হয় না কেন? একজন ফুচ্‌কাওয়ালাও তার ক্রেতা আর উৎপাদকের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, আপনাদের কি সেরকম কোন দায়বদ্ধতা নেই?'

হেডমাস্টার বললেন, 'তোর ছাতি কত উঁচু, আমাদের তো উঁচু ছাতি নেই, আমাদের কি তবে ভীষণ লজ্জা পাওয়া উচিত?' কি কথার কি মানে, অণিমা সেদিন চুপ করে গিয়েছিলো। কোন প্রকাশ্য মন্তব্য করেনি। সেদিন ধৃতরাষ্ট্র সভায় মহাভারতের গুণীদের উপস্থিতির মতো কমনরুমের মাষ্টাররা হেসে উঠেছিল। কেউ আপত্তি করেনি। অণিমা স্বগতোক্তি করেছিল 'ইতরগুলো সব।'

টইটম্বুর কমনরুমে ঢুকেই হেডমাষ্টার ভবতারণবাবু রাগস্বরে বললেন 'এই নে অণিমা প্রাইজের টাকাটা রাখ।' বলেই অণিমাকে তিনশো টাকার নোট গুঁজে দিলো।

হঠাৎ সবার সামনে অণিমাকে টাকা গুঁজে দিতেই অণিমা একটু অস্বস্তিতেই পড়লো। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কি টাকা দিচ্ছেন?'

—'তোরা কাল আমার নাতির অন্নপ্রাশনে তিনশো টাকার প্রাইজ দিয়েছিস্ কেন? আমার পাওনা সাতশো টাকার প্রাইজ। তবে তিনশো টাকা কেন? যে সব ডেপুটি অতিথিরা এসেছিলেন তাদের কাছে আমার মাথাটা নীচু হয়ে গেল। তোরা না দিতে পারতিস্! তা'বলে তিনশ টাকার প্রাইজ?' ভবতারণবাবু অবলীলায় বলতে থাকলো 'কমিটিতে পাশ করা ছিল সাতশো টাকার প্রাইজ দেওয়া হবে। তিনশ টাকার প্রাইজ দিয়ে আমাকে পাঁচজনের কাছে অপমান করা হোল।'

শিখা চন্দার সহ শিক্ষিকা। তিনি বললেন 'কি বলছেন স্যার।'

'বামুনের ছেলে তেলিকে বিয়ে করেছে বলে ছেলের বিয়েতে তো মাস্টারদের খোঁজেন নি, আর সাতশো টাকা পাবেন এই হিসেবের লোভে আপনি নাতির অন্নপ্রাশন করেছেন এতে কি প্রাইজ দিতে বাধ্য?'

ভবতারণবাবু বললেন 'না হয় না দিবি। সেই জন্যেই তো টাকা ফেরৎ দিচ্ছি।'

কমনরুমের অন্য শিক্ষক বললেন 'একসঙ্গে দু'টো কাজ পড়ে যাওয়ায় একটু চাপে পড়ে গেছি। তাছাড়া সাব স্টাফের ছেলের ব্যাপার, তাকে একটু ভাল জিনিষ দিতে গিয়ে বেশী খরচ হয়েছে তাই নাতির জন্য তিনশ টাকার প্রাইজ দিয়েছি। এতে কি এতো লজ্জা আপনার। বাইশ হাজার টাকা বেতন পান। মাত্র স্বামী-স্ত্রী। ছেলেদের পৃথক করে দিয়েছেন, টাকা কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। হচ্ছেটা কি?' মৃদু তিরস্কারের ছলে ভবতারণবাবুকে বললেন।

খাঁপুর হাইস্কুল। প্রায় বারশ ছাত্র। শিক্ষকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। কেরাণী বিকল প্রায়। তিনশ টাকায় একজন সহকারী নিয়ে কাজ চালায় কেরাণী। হেডমাষ্টার ভবতারণবাবু একটাও চিঠি লিখতে পারেন না। দশ লাইন চিঠি লিখলে অন্তত সাতটি

ভুল চোখে পড়বে। ক্লাস নেন নামমাত্র। মাত্র দু'টি ক্লাস নেন। তাও আবার পনের মিনিট অন্তর বিড়ি খাওয়া চাই। স্কুলের গাড়ী বারান্দায় ফুক্‌ফুক্‌ করে বেমানানভাবে বিড়ি খান তিনি। কোন কাজে ডি. আই. অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। কোন সুযোগই নেই। অথচ কুলপানা চক্র। বাইশ হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়। সেও গোনে গোনে নেয়। নোট জড়িয়ে গেলে জিভের থুথু দিয়ে গোনে। সহকর্মীর কথা শুনে বলে 'কী যা-তা বলছো তোমরা?'

—'বলব না? আমরা তিনজন খেতে গেছি বলে কি অপাত্রে পড়ে গেছি নাকি? এই নিন একশ টাকা রাখুন। চল্লিশ টাকা ফেরত দিন। এক চাকা মাছ, ফেন ঢালা ডাল, ছ্যাচড়া আর দু'টো মিহিদানার দাম কুড়ি টাকার বেশী হয় না। ষাট টাকা নিয়ে চল্লিশ টাকা ফেরৎ দিন তো।' বলেই সে একশ টাকার নোটটা ভবতারণবাবুর দিকে ছুঁড়ে দিল।

গোটা কমনরুমের অন্যান্য সহকর্মীর ছ্যা ছ্যা করে উঠলো। 'ছিঃ ছিঃ কেউ কখনো উপহারের টাকা ফেরত দেয়। ছিঃ?'

অতি ধিক্কারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ভবতারণবাবু। বেঁটে খাটো গ্যাঁড়া কাঁচাপাকা চুল। মুখের চাঁছা গোঁফ দাড়ি সাদা ধবধবে। ফুল হাতা পাঞ্জাবীর কাপড় পরা হেডমাষ্টার ঘাড় নীচু করে বেরিয়ে গেলেন।

নিজের চেয়ারে গিয়ে বললেন তিনি। মনটা একটু খারাপ হয়ে গেলো। বোধ হয় ঠিকমতো করে বলা হোল না। পিয়নকে ডেকে বললেন 'এক কাপ চা আনো তো।'

একটু পরেই দোকানদার চা দিয়ে গেল। চা মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে দোকানদারকে চেঁচিয়ে বললেন, 'কী চা এনেচু রে একদম ঠাণ্ডা। যা বাবা একটু গরম করে আন।'

—'কী করে বুঝলেন চা ঠাণ্ডা?' দোকানদার জিগ্যেস করলো।

—'এই তো খেয়ে দেখলুম।' বলেই সে আবার চায়ে চুমুক দিল।

'ইস্‌ একদম ঠাণ্ডা যা বাবা একটু গরম করে দে। যা নিয়ে যা।'

এঁটো চা গরম করে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করলো।

দোকানদার বললো 'এঁটো চা গরম করবো কি করে?'

হাসতে হাসতে ভবতারণবাবু বললেন 'একে বামুন তার উপর হেডমাষ্টার তার এঁটো চা গরম করা যাবে না?'

—না যাবে না। আমি অন্য গরম চা এনে দিচ্ছি।

—'টাকার কি ফুল গাছ দেখেচু। আবার এক কাপ চা। যা, বেরো তোর দোকানে আর খাব নি।'

দোকানদার চিৎকার করে বলে, 'ভারীতো আমার খদ্দেররে। শালা গ্যাঁড়া বামুন, তার এঁটো চা গরম করো। সবাই খাচ্ছে, ওর গাঁড় চড় চড় করছে। ঠাণ্ডা হয়ে গেল।' এমনই খিস্তী দিয়ে গেল সে।

দোকানদারের কথা শুনে প্রতিবাদ করা দরকার তাই হেডমাষ্টার ভবতারণবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, 'অত গরম কিসের রে, তিন পয়সার দোকানদার।'

আর যায় কোথায় হেডমাষ্টারকে তেড়ে খিস্তী দিল দোকানদার। সে চীৎকার করে বললো, 'তিন পয়সার দোকানদার তো তোর বাপের কি? তোর খাই না পরি। শুয়োরের বাচ্চা। পিয়ন নেবার সময় বার হাজার টাকা ঘুষ তোর নিজের জন্যে লিয়েচু। শালা চোর বুড়ো ভাম, জালি। লজ্জা করে নি তোর।' ভেংচি কেটে বলে, 'বৌমাকে বলেছিলি চাই, দিবি না মা একবার? শালা কুত্তা।'

আর পাঁচজন মাষ্টারমশাই এসে দোকানদারকে দাবড়ি দিয়ে থামায়। ততক্ষণে ভবতরণবাবু অফিস ঘরে ঢুকে গেছেন।

ভবতারণবাবু অযথা ডাকেন 'অণিমা, আয় তুই একটা কাজ কর।'

অণিমা এলো। 'বোস চেয়ারটায়।' বসলো অণিমা। 'নে দেখ কাগজটায়।' বলেই কাগজটা বাড়িয়ে দেয়।

অণিমা কাগজের কোন উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। সে বোঝবার চেষ্টা করে কাগজের মধ্যে।

চোখের চশমাটি খুলে লেন্সটি মুছতে থাকেন ভবতারণবাবু। গোগ্রাসে পাঠ্যরত অণিমার দিকে তাকায়। অণিমার ধারালো নাক, কামরাঙার মতো সরু ঠোঁটের দিকে তাকায়। তাকায় তার ঢাকা অঢাকা শরীরের দিকে। মহিলার রঙিন ছবির পাশে হাতে লেখা একটা ক্যাপসন ছিল যা অন্য অর্থ বহন করে, যা সামাজিক ক্ষেত্রে কদাচার হিসেবেই গণ্য হয় সেটিই পড়াতে চাইলেন ভবতারণবাবু। ছবিটির পাশে লেখা ছিল 'কি বলতে চাই বুঝতে পারিস না?'

অণিমার গলা ধরে আসে 'স্যর কি লেখা বলছেন', তার কথায় ভবতারণবাবু ঘাবড়ে যায়। নিজেকে সামলে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলেন, 'কী, কী লেখা কি? যেন ন্যাকা। কি দেখচু'।

—'আপনি এই ছবিটার কথা বললেন তো? এই লেখাটা?'

—'না-না শিক্ষা সংক্রান্ত নোটিশটা পড়তে বললুম। নিজ উদ্দেশ্যকে একদম উড়িয়ে দিয়ে বললেন 'দেখো দেখি কি সব কে বাজে কথা লিখেছে।'

অণিমা বুঝতে পারলো ভবতারণবাবু কিছু লুকোচ্ছেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'স্যর নোটিশটা ওদেরকে পড়াচ্ছি।' নোটিশটা পড়তে গিয়ে দু'একজন মাষ্টার বললেন 'পেপারে এ কথাটা কে লিখলো।' অণিমা বললো 'কি জানি'।

শিখা চংদার বললে 'এটা হেডমাষ্টারের লেখা তুমি বুঝতে পারছ না 'অণিমা?'

অণিমা উদাসীনভাবে বললো 'কই নাতো?' ওরা পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে

হাসলো। ছুটির ঘন্টা বাজলে ভবতারণবাবু অণিমা মাষ্টারকে বললো 'তোর বাড়ী যাব সন্ধ্যায়। থাকবি।' অণিমা বললো 'আচ্ছা।'

--'অণিমা আছু।' হেডমাষ্টার ডাকলো অণিমার সদর দরজায়, যেন জামাইবাবু সেজেছেন। চওড়া পাড় ধুতি, সুন্দর ক্রীজ দেওয়া পাঞ্জাবী পরিহিত বাবু ভবতারণ যখন এলেন তখন সন্ধ্যা সেইমাত্র হয়েছে। দিনমানে ক্লান্ত জননীরা তখন সবাই যেন সন্ধ্যা দিতে ব্যস্ত।

অণিমার মা বললেন, 'আসুন, মাষ্টারদা ভিতরে আসুন।' তিনিও যথেষ্ট বয়স্কা। অবশ্যই ভবতারণবাবুর চেয়ে বয়সে বড়। তাকে বসতে দিয়ে অণিমাকে ডেকে দেবার জন্য চলে গেলো সে।

ব্যস্ত অণিমা হাসতে হাসতে বললো 'স্যর এসেছেন। বসুন স্যার।' বলেই সে সোফায় বসে পড়লো।

কোন ভণিতা না করেই ভবতারণবাবু অমায়িকভাবে বললেন, 'আমি তোমাকে কি বলতে চাই সেটা বুঝতে পারছো না কেন? তোমার কাকীমা অসুস্থ। তোমাকে ছাড়া আমি ভীষণ কষ্ট পাই। আমাকে একটু দেখো অণি।'

'তুই' থেকে হঠাৎ 'তুমি' হয়ে যাওয়ায় ভয় হয় অণিমার। কিন্তু সেরকম কোন সন্দেহ না করেই চুপচাপ বসে থাকে কি বলবে সে বুঝতে পারে না। ভবতারণবাবুর এত টাকা তবু ছেলেদের সঙ্গে পোষ্য নেই। স্ত্রী অসুস্থ। বিবাহিত জীবনের রোমান্স আর নেই। পরস্পরকে চিনে বুঝে বুড়ো হয়েছে দু'জনেই। তার পারস্পরিক টান ভীষণ না থাকলেও থিতু হওয়া জলের মতো সম্পর্ক। হরিণীর মতো চঞ্চল অথচ ধীর, নদীর মতো বেগবতী অথচ শান্ত, পায়েসের মতো থক্‌থকে মিষ্টি অথচ নরম, আকাশের মতো অধরা অথচ হাতের কাছেই সেই অণিমা, শ্রদ্ধা ঢের কিন্তু প্রেম এসে বুড়োর ঘর ভেঙ্গে দেয় বানের মতো। অণিমা সেরকমভাবেই ভবতারণবাবুর কাছে পল্লবিণী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। এই আবেগ এই ঊর্দ্ধশ্বাস এই সচকিত প্রেম এই আনন্দ সব মিলিয়ে ভবতারণবাবু বড় একা অসহায়। মেয়ের মতো অণিমা অতি স্নেহভাজনীয়া, তার সঙ্গে স্বপ্নমেদুর কোন সহবাস তো দূরের কথা সংলাপ পর্যন্ত করা যায় না। 'এই বৃহৎ' না কে জানা সত্ত্বেও ভবতারণবাবু নিজের কাছে বিপন্ন। 'বাঁচাও, অণিমা বাঁচাও।' যেন আকণ্ঠ তৃষ্ণা। যেন এখনই অণিমার চুমো খেলে ভবতারণবাবুর বুক দু'টো জুড়োয়। তার হাত ধরে ফেলে ভবতরণবাবু। অস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারণ করে 'অণিমা' শুকনো কঠিন রুক্ষ মরা মাটি জল পেলে যেমন নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে, মুহূর্তের মধ্যে অণিমা যেন গলে যাবার উপক্রম করে। সে বুঝতে পারলো না কি বলবে। কি বলা উচিত তার। একটু তাকাতেই দেখলো অসহায় বৃদ্ধ ভবতারণ মাষ্টারের চোখে জল। বাপের মতো মনে করে আঁচল দিয়ে জল মুছিয়ে দিলো অণিমা। সে ভাবলো সেই দুঃসহ দিনগুলোয় যেদিন তারা

পিতৃহীন ভীষণ অসহায় সেদিন তো এই বৃদ্ধই কন্যাস্নেহে তাকে চাকরী দিয়েছিলো। এরই স্নেহচ্ছায়ায় তাদের পরিবারটি বেঁচে আছে, তাই তাকে দেখাতো তার প্রাথমিক দায়। সে বলে, 'বলুন স্যার কি করে সাহায্য করব?'

—তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারো না অণিমা?

—স্যার বুঝতে পারি। আপনি মেয়ের মতো আমাকে ভালবাসেন।

'মেয়ের মতো' কথাটায় আপত্তি করতে চায় ভবতারণবাবু। কিন্তু সে পারে না। অণিমা বলে, 'আপনার সেবা করার সৌভাগ্য কি হবে আমার স্যার। আপনি না থাকলে কোথায় তলিয়ে থিতিয়ে যেতাম। কিন্তু কেমন করে?'

—'বড় ইচ্ছে করে তোমাকে আদর করি।' অণিমা ভবতারণবাবুর মধ্যে বাবাকে দেখে। ভবতারণবাবু অণিমার মধ্যে প্রিয়তমাকে খুঁজে পায়। 'তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করে অণিমা ...' বলেই সে অণিমাকে বুকের দিকে টানতে থাকে।

—'স্যার।' কেমন মোহগ্রস্থ হয়ে যায় অণিমা। সে ভবতারণবাবুর বুকের মধ্যে কেমন যেন নিস্ক্রিয় হয়ে ঢলে পড়ে।

ভবতারণবাবুর ব্যাকুলতা একটা ফোঁকর খুঁজে। একটা নিশ্চিন্তে আশ্রয়ের খোঁজে ক্রমশ তার হাত দু'টি অন্য আগ্রহে অণিকে কোলের দিকে টানতে থাকে। অণিমা যেন অবশ হয়ে যায়। যেন মুক্ত। যেন ভারহীন। যেদিকে টান সেদিকেই পতন।

দরজার বাইরে থেকে ডাকে 'অনি। তোর মেয়ে কাঁদছে।' অণিমার যেন ঘোর কাটে। অণিমার মার কেমন যেন মনে হোল। সে বসে পড়লো তাদেরই পাশে।

ভবতারণবাবু বললেন 'আপনি একটু আসুন, আমাদের কথা হচ্ছে।'

—'কী এমন কথা যে মায়ের কাছে বলা যাবে না?' একটু রাগ নিয়েই বললো সে।

—'তবে এখন থাক। পরে হবে 'খন।' বলেই হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভবতারণবাবু।

অণিমা কিছু বলবার আগেই তিনি চলে গেলেন।

এখন অনেক রাত। আকাশের সব তারা এই ছাদের উপর উঠে এসেছে কেন? বারান্দার ফাঁক দিয়ে দূর আকাশের অনেক নক্ষত্রকে দেখা যাচ্ছে। আলগা গায়ে শুয়ে আছে অণিমা। রাতে শোয়ার সময় জামা গায়ে রাখে না সে। এটা তার অনেক দিনের অভ্যেস। ছেলে প্রতীমের বয়েস দেড় বছর। বুকের দুধ খেতে তার ভীষণ ভাল লাগে। এবং অণিমারও ভাল লাগে তাকে দুধ দিতে। গভীর রাতে প্রতীম কেঁদে উঠতেই ঘুম ভেঙ্গে যায় অণিমার। অণিমা তাকে আদর করে তার ডানদিকের স্তন বৃন্তটি প্রতীকের মুখের ভিতর পুরে দিলে বামদিকের বৃন্তটি ডান হাতের ছোট্ট আঙ্গুল দিয়ে ঘাটতে ঘাটতে প্রতীমও ঘুমিয়ে পড়ে। এক কঠিন সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে অণিমা একদিকে প্রতীমের মা এবং অরুণাভ অন্যদিকে ভবতারণবাবুর আর্তনাদ। এই রমণী কোন রমণীয় লাবণ্যের কাছে নিজের বৈভবটুকু স্পষ্ঠ করে রাখবে সে কথা ভাবতে ভাবতে নক্ষত্রের আলোর নীচে

প্রতীম এবং তার মা ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে জগৎ সংসারের সমস্ত আলোড়ন ভুলে গিয়ে। অনাদি অনন্তকালের মাতৃমুখখানি নিয়ে অণিমাও কেমন উদাসীন হয়ে যায় ঘুমের মধ্যে।

ইতিহাসের ক্লাস শুরু হবার আগে, সব ক্লাসের মাষ্টারদের সঙ্গে দেখা হয় ভবতারণবাবুর। ক্লাসে যাবার আগে কথা বলা সৌজন্য বিনিময় ছাড়া অন্য কিছু না। অণিমার সঙ্গে দেখা হতেই মৃদু স্বরে বললেন, 'সন্ধ্যায় একবার আশ্রমে এসো তো।'

—'কেন স্যর।' উদ্বিগ্ন অণিমা বললে।

—'এসো না, একটা কথা আছে।' ভবতারণবাবু হাসতে হাসতে বললেন।

—স্কুলে বলা যাবে না?

—'বোকা মেয়ে! যে কথা কানে কানে বলতে হয় সে কথা কি চিৎকার করে বলা যায়?' মৃদু হাসলেন ভবতারণবাবু। ভবতারণবাবুর এখন আর কোন ভয় নেই। ভীষণ নিরুদ্বেগ। একটু লজ্জা লজ্জা ভাব।

প্রায় উদাসীনভাবেই বললো 'কখন?'

—'সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ। আশ্রমের বকুলতলায়।' ক্লাসে ঢুকে গেলেন ভবতারণবাবু।

'আচ্ছা' বলেই অণিমা নেমে এলো দোতলার ক্লাসরুমে।

অণিমার গা হঠাৎ গুলিয়ে উঠলো যেন। বমি পাচ্ছে কেন? সন্ধ্যা ছ'টায় আশ্রমের বকুলতলায় দেখা করতে হবে শুনে সত্যিই গা গুলিয়ে উঠলো। কেন কি এমন দরকার তার। এরকম কত কি প্রশ্ন জাগলো তার মনে।

টিফিনের ঘণ্টা বেজে গেলে সহকর্মীদের জিগ্যেস করলো অণিমা। তারা তাকে কোন সাহস দিলো না। না যেতেও বললো না।

কমিটির সম্পাদকের কাছে গেল অণিমা। তিনি সব শুনে বললেন, 'ওটা আপনাদের একদম ব্যক্তিগত। আমার কোন মতামত নেই।'

অণিমা বললো 'ব্যক্তিগত সমস্যাটা আপনার স্কুলে তো ঘটছে।'

—'তাহলেও এটা একদম ব্যক্তিগত।' সম্পাদক বললেন।

—তাহলে?

—আপনার ইচ্ছে।

—যখন অভিযোগ হয়, তখনও কি ব্যক্তিগত থাকে?

—না থাকে না।

—তাহলে?

সম্পাদক বললো, 'না, জানি না। হেডমাস্টার আর ক' দিন আছেন ওকে বিব্রত করব না আর। দেখুন আশ্রমে ডেকেছেন হয়তো কারো সঙ্গে আলাপ করাবেন, না হয় দীক্ষা দেবেন। যাবেন কিনা তা আপনার ব্যাপার।'

অণিমা নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি। নিজেকে বিকশিতও করেনি। মহা প্রকৃতির নিয়মে ফুল যেমন আপনা থেকেই সুন্দর হয়ে ফুটে উঠে তেমনি ফুটে উঠেছে। কাউকে সে বিব্রত করেনি। নিতান্ত সাপের মতো সহজ সরল। সাপ তার ঘাড়ের সৌন্দর্য নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, কাউকে কামড়াবার জন্যে নয়। তার ক্ষুধার্ত পেটটুকু বাঁচলেই সে বাঁচে, এতেই তার শান্তি। অণিমা তারই মতো। অবিকল একটি নির্বিষ সুন্দরী, নিরীহ সর্পিনী যেন।

দু'জন প্রতিবেশী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আফ্‌সরের রিক্সা চেপে বললো 'চলো আশ্রম' তখন ঠিক ছটা কুড়ি। সন্ধ্যার আবছা আলোয় গোটা পরিবেশকে কারা যেন মায়াবী করবার পরিকল্পনায় লিপ্ত হয়ে গেছে। নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখবার নির্দেশ দিয়ে ঠিক বকুলতলায় চলে গেল অণিমা।

বকুল গাছের গোড়াটা আরো আবছা। এখান থেকে অন্তত সহস্র হাত দূরে 'সাধন কুটীর।' সেখানেই প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া হয়। ভক্তরা করতালি দিয়ে গান গাইছিল।

জিগ্যেস করলো অণিমা 'স্যর আছেন'?

—'হ্যাঁ এসো।' ভবতারণবাবুর গলায় যে আনন্দের ধ্বনি বেজে উঠলো।

আরো একটু আঁধারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, 'চলো ঐদিকে যাই।'

—'ওখানে অন্ধকার স্যর। অন্ধকারে মেয়েরা খুন হয়। আমি যাব না।'

কাব্য করে বলে উঠলেন ভবতারণবাবু 'অন্ধকারের মতো বিস্মৃতি কারো তো নেই অণি। অন্ধকার ভীষণ উদার। অন্ধকারে নিজেকে মেলে দেওয়া যায়। অন্ধকারে কোন ইতস্তত থাকে না। অন্ধকারে কোন লজ্জা নেই। অন্ধকারেই তো আলোর জন্ম। চলো অন্ধকারে যাই।' স্বপ্নের ভঙ্গীতে ভবতারণবাবু বলে চললেন।

'না স্যর। অন্ধকারকে আমার ভীষণ ভয় করে। আমার বাবা অন্ধকারে হারিয়ে গেছেন। দারিদ্রের অন্ধকারে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়েছিল। অন্ধকারে ব্যক্তি হারিয়ে যায়। অন্ধকারে নৈতিকতার মুখ দেখা যায় না। আমি যাব না স্যর। ওখানটায় ভীষণ অন্ধকার। বরং নদীর দিকে চলুন।'

দূর থেকে খাদের নিরীক্ষণ করা উচিত বলে তারা নিরীক্ষণ করে যাচ্ছিল দু'জনকেই। ভবতারণবাবু তা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না।

হাঁটতে হাঁটতে একটা কাছাকাছি জায়াগায় এসে গেলো তারা। দু'টো বাঁদর পোষা আছে এখানে। একটা অস্পষ্ট আলো জ্বলছিল বাঁদরদের জন্যে। ভবতারণবাবু দেখলেন এই সেই নির্দিষ্ট জায়গা। এখানে এসময়ে যদি অণিমাকে শক্ত করে ধরা না যায় তবে তাকে ধরা আরো কঠিন হয়ে যাবে। ভবতারণবাবু তার ডান হাতটা ধরে নেয়। 'অণিমা শোন'। শরীরের ভেতর থেকে একটা তীব্র উত্তেজনায় অণিমার হাতটাকে দারুণভাবে চেপে ধরে। যেন উত্তেজিত ভবতারণবাবু তার রক্তের উত্তেজনাকে অণিমার শরীরময় চারিয়ে দিতে চান। নিমেষের মধ্যে এক হ্যাঁচকা টানে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে অণিমার ঠোঁট দু'টিতে চুমু দিতে চায়।

অণিমার সমস্ত শ্রদ্ধা সমস্ত ভক্তি নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেলে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ভবতারণবাবুকে। ক্রুদ্ধ অণিমার কাছে হেরে যাবার ভয়ে বলতে থাকেন 'অণিমা, শোন অণিমা।' অণিমা বললে 'স্যার—'

—তোর পাঁচটা ছেলে বন্ধুর সঙ্গে হাসি মজা করতে পারিস তার বেলায় দোষ নেই; আমি তোর উপকারী লোক আমার বেলায় যত দোষ।'

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে অণিমা। তারপর বললে, 'ঢি ঢি পড়ে যাবে। আমার সহস্র ছেলে বন্ধু থাকবে বলেই কি বাবার বন্ধুর সঙ্গে থাকতে হবে আমাকে?'

'ছিঃ ছিঃ স্যার।' ছুটে পালিয়ে আসে রিক্সার কাছে। অণিমা মাস্টারকে দেখে বিপন্ন মনে হোল সবার। জিগ্যেস করলো, 'দিদি কি হলো?'

—ভবতারণবাবুকে একটু দিয়ে দেবো দিদি?

খুব শান্ত ও সংযতভাবে বললো 'না।'

আফসারের রিক্সায় উঠে পড়তেই আফসার রিক্সা চালাতে শুরু করলো। হন্তদন্ত হয়ে নাছোড়বান্দা ভবতারণবাবু ছুটে এসে বললেন 'অণিমা! শোন, একসঙ্গে যাব।'

—'না স্যার আপনি একা আসুন।' অণিমা তখনো শান্তভাবেই বললো।

কিছুতেই শুনলেন না ভবতারণবাবু। তিনি অগত্যা চেপে বসলেন রিক্সায়।

নদী বাঁধের মাঝ রাস্তার নির্জনতায়—অণিমার হাত দু'টি কোলে তুলে নিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করতেই অণিমা ভীষণ বিরক্ত হোল।

রিক্সাওয়ালা বললো 'কী হচ্ছে কি স্যার?'

কেউ কোন কথা বললো না।

রিক্সা থেকে নামবার সময় ভবতারণবাবুর হাতটা শালীনতা ছাড়িয়ে গেল। কোনক্রমে নিজেকে রক্ষা করলো অণিমা।

এখানটায় সন্ধ্যাকালে এমনিতেই প্রচুর লোক। প্রচুর লোকজন, ঘর ফেরতা লোক বাস ধরবার জন্যে অপেক্ষমান। অণিমা রিক্সা থেকে নামবার আগে ভবতারণবাবুকে নামতে দিলেন। রিক্সা থেকে নামলো অণিমা। এত কিছুর পরেও নির্লজ্জের মতো মিটমিট করে হাসছিলেন ভবতারণবাবু।

—'কিরে পয়সা দুব?' ভবতারণবাবু তারিয়ে জিগ্যেস করলেন অণিমাকে। আগেই যেহেতু আফসারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল তাই ভাড়া দেওয়ার দরকার ছিল না। অণিমা বললো 'যা দেবার আমিই দিচ্ছি স্যার।'

রাগে অভিমানে ক্রুদ্ধা অণিমা বললে 'সবের একটা সীমা আছে স্যার। আমাকে ক্ষমা করবেন।' বলেই পায়ের চটিটা খুলে ভবতারণবাবুর গালে চটাস্ করে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। চারদিকের অজস্র লোকের সামনে হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চটির আঘাতে ভবতারণবাবুর চশমা চোখ থেকে ছিটকে পড়লো, সে হাউমাউ করে না কাঁদতে পেরে বিড়বিড় করে বললে 'অণিমা তুই আমাকে জুতা মারলি।'

পার

কানাকানিতে শোনা গেল বীমা অফিসে একজন ক্যাজুয়েল কর্মী নিয়োগ করা হবে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে। আপাতত দৈনিক মজুরী হলেও পরে এটাই স্থায়ী পদে উন্নীত হয়ে যাবে। কানাকানিটা ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগলো। বীমা অফিসের সর্বত্রই আলোচনা হতে লাগলো তলায় তলায়। সবাই জানে, অথচ কেউ জানে না। আলগা পেট মেয়েরা যেমন বলে তোমাকেই বললুম। যেন বজ্র আটুনি ফস্‌কা গেরো। কথাটা নাচতে নাচতে জনৈক ডি. ও-র এ্যাসিসট্যান্ট বনার কানেও এসে হাজির হোল। বনা প্রথমে যাচাই করবার জন্যে তার অফিস বস্‌কে জিগ্যেস করলো, 'ব্যাপারটা কি?'

তিনি বললেন 'সত্যি সবটাই, তবে সত্যির মতো করে নেওয়া হবে না। তুমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলো।'

কথাটা কানে যেতেই দারুণভাবে নাচাচ্ছিল তাকে। মনে মনে কত কি ভাবছিল বনা। তার তো আর হেরে যাবার ব্যাপার নেই। কেননা ম্যানেজার-এর সঙ্গে তার সম্পর্কটা বেশ ভাল। তিনি ভালই পাত্তা দেন। অবশ্য এ ব্যাপারে বনা সতর্কই আছে যে অফিসারদের পাত্তা দেওয়াটা নদীর ধারে বসবাসের মতো—নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। কেউ তো কারো চালিয়ে দেবে না। কিন্তু কেউ কিছু না চালালেও যে যার নিজের মতো চললেও তো হবে। যাই হোক সেদিন স্থির থাকলো বনা। সে ভাবলো টাকারও তো দরকার আগে বাড়ীতে আলোচনা করি তবে এ ব্যাপারে এগোবো।

ঘাম শহর বড় বিচিত্র শহর। এখানে সবাই ঘামে। কাজের লোক অকাজের লোক সৎ লোক, অসৎ লোক, নেতা-হাতা সবাই ঘামে। এখানে কাজের চেয়ে ভান করে এরা বেশী। হেথায় অফিস বস্ কাজের ভয়ে ঘামে, তার সহকর্মীরা কুঁড়েমিতে ঘামে। এই ঘাম রোগের জন্যেই বুঝি কতকাল আগে কেউ শহরের নাম রেখেছিল ঘাম।

ঘামের নেতা অবন। অবন নিশি। দোহারা চেহারার বেঁটেখাটো গড়নের মানুষটি বনার অনেকদিনের বন্ধু, একসঙ্গেই তারা কলেজ রাজনীতি থেকে রাজনীতি করেছে। ফাইফরমাস মিটিং মিছিল হ্যান ত্যান সব করেছে। খুবই ঘনিষ্ঠ বনার। দু'জনের পীরিতও খারাপ নেই। মিটিং মজলিসে ভাল বক্তা অবন তাই ঘামের মতো মফঃস্বল শহরের নেতা সে। কিন্তু সন্দেহ একটা থাকে বনার যে 'সব শালা স্বার্থবাদী। নিজের আখের না গুছিয়ে কোন শালা কিছু করল না।' সে স্পষ্ট দেখেছে বিশাল নেতা, ঘ্যাম। সন্ন্যাসী। ধোয়া ধুতি ছাড়া পরেন না। লোকে ভাববে আহা রে কত ত্যাগী মানুষ, কিন্তু বনা তো জানে মাসিক রোজগারের জায়গাটা আগে পাকা করে নিয়ে তারপর তাদের 'তন্ত্রবাদ'-এর প্রবর্তন করার প্রয়াস। কেউ সরকারী পেনসন পান, পার্টির বেতন, কেউ ছেলে-মেয়েদের চাকরী, কেউ কেউ ভাইদের ভগ্নিপোতদের ব্যবস্থা পাকা করেছে। প্রত্যেক

নেতাই নিজের জায়গাটা গোছগাছ্ করে লোকের কাছে হম্বিতম্বি করছে হ্যান করো ত্যান করো। এইসব দেখে বনা নিজের মতো সবটা গোছাতে না পারলেও নিজেকে বেকার রাখেনি। তিনশ টাকা মাইনেতেই জনৈক ডি. ও-র কাছে চাকরী নিয়েছে। বেকার ছেলে তিনশ'র বেশী আর কি পাবে। বনা খোঁজ নিয়েছে সরকারী ডাক্তারদের আণ্ডারে যে সব এ্যাসিসট্যান্ট চেম্বারে কাজ করে তাদেরও বেতন তিনশ টাকা। তাই বাইরে বাইরে শ্রদ্ধার ভান করলেও দারুণ হীনমন্যতায় ভোগে বনা। বনা তাই চাণক্যের মতো এদের বিশ্বাস করে না—'স্ত্রীষু রাজকুলেষু'। এরা যেন কোনদিনই বিশ্বাসের যোগ্য হয়ে ওঠে না।

বাড়ীতে আলোচনা করতেই স্ত্রী বলেছে দরকার হোলে কানের রিং দু'টো, হাতের যে ক' গাছা চুড়ি ছিল তা বিক্রী করে দিতে পারো। যেমন তেমন করে এই নিয়োগটার সুযোগ নিতেই হবে।

বনা তার বউকে দারুণ ভালবাসে। ওদের বাড়ীর দুর্দিনে বউটিই তো একটা সময় অঙ্গনওয়াড়ীর এক'শ টাকা হাতে দিয়েছে। বনা সরকারী ভেলকী দেখেও মজা পায়। ব্যঙ্গ করে এক'শ টাকা নিয়ে কয়েক হাজার মেয়েকে আটকে রেখেছে সরকার। কী মজা।

অবশ্য এর জন্য বনাও দায়ী। সেও তো শ্লোগান দিয়েছে হাতিয়ার সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। অবশ্য বনা এটাও দেখেছে তো এক'শ টাকা হাতখরচ পেয়েছে তার বউ। ক্ষতি কি। আরো পেলে ভাল হোত কিন্তু পায়নি।

অবনের সঙ্গে সম্পর্কের সুযোগটা নিতে চায় না। এসব প্রয়োজনের কথা রাজনীতির নেতাদের তো বলতেই হবে। এসব কাজ তো তাদেরই। রাজনীতির সুযোগ নেবার ইচ্ছে তার ছিল না এমন নয়, আগেও চেষ্টা করেছিল কিন্তু তেমন করে তীব্রতা অনুভব করেনি। কিন্তু ক' বছরের মধ্যেই যখন নেতাদের মধ্যে সুযোগের হ্যাংলামি দেখেছে তখন সেও তার মতলবকে প্রত্যাশায় রূপান্তর করেছে। যতটা পারা যায় ততটাই চেষ্টা করবে সে। ঘরের আলোচনায় সে নিজের সাহস অর্জন করলো যেন বেশী করে।

পরের দিনই বনা অফিস থেকে খবর সংগ্রহ করলো। ইউনিয়নটাও গুরুত্বপূর্ণ। তারাও এ ব্যাপারে খবরদারি করবে। যেহেতু ইউনিয়নটি অবনদের সমর্থক তাই বনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল যে অবন এ ব্যাপারে তাদের প্রভাবিত করতে পারবে। অবনের সুপারিশের সুযোগটা বনা ছাড়া কেউ পেতে পারে না।

বনার কাছে এখন অফিসের দরজা-জানালার আশ্চর্য মোহ ছড়িয়ে পড়লো। সমস্ত মানুষগুলো যেন মুহূর্তের মধ্যে আত্মীয় হয়ে গেল। যারা অফিসে এসে কষ্ট পায় কাজ পেতে হয়রানি ভোগ করে তাদের জন্য তার মমতার দুয়ার গেল খুলে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো তার বসের উপর, কেননা তিনি তাকে এই অফিসে বসার জন্য একটা

চেয়ার দিয়েছেন। গান গাইতে ইচ্ছে করলে বনার 'হবে হবে জয়' আর দুঃখ নেই তার প্রাইমারীতে চাকরী হয়নি বলে। আর বয়সও নেই। রাগ নেই অবনরা স্বামী-স্ত্রী চাকরী করে বলে। এই মুহূর্তে তার মনে হয় এটাই বুঝি কপাল। সময়ের জন্য অপেক্ষা করা দরকার। সময় না এলে কিছুই হয় না, এতটা সময় পেরিয়ে গেল এই সময়টা আসবার জন্যেই বুঝি। বস্‌কে ব'লে বসের কাছ থেকে একটু ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেল বনা।

তখন কাটখোট্টা রোদ চারদিকে ভয়ঙ্কর গরম। রাস্তার লোকগুলো যেন ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। পুড়ে যাচ্ছিল বনা। পায়ে একটা চটি, নস্যি রঙের তিন বছর বয়সের এবং প্যান্ট, সেই বয়সেরই একটা গোলাপী হাফ হাতা জামা। খোঁচা খোঁচা মুখময় দাড়ি। মাথায় চুল উলটে আঁচড়ানো। বোধকরি বসন্তের দাগ তার মুখময়। দুধে আলতায় গোলা না হলেও গায়ের রঙ তার উজ্জ্বল। সাদাই বলতে পারি তার রঙ। রোদজলে একটু তামাটে।

সেই পুরানো আধভাঙা সাইকেলটা নিয়ে বনা অবনের বাড়ী গেল। কড়া নাড়তেই অবনের বউ একটু বিরক্তই হোল যেন। সে বনাকে চেনে, বেশ ভাল করেই চেনে। ভেতর থেকেই অবনের বউ বললো 'সে বাড়ী নেই'। তবে কি অবনের বউরা চিনতে পারেনি। সাহসী বনা বললো 'আরে বাইরেই আসুন না, দেখুন কে ডাকছে।'

ঈষৎ গাম্ভীর্য অথচ মৃদু ভর্ৎসনা করেই বললে 'ওদের বিয়ে করা ঠিক হয়নি বনাদা। দেখুন গে বোধ হয় পার্টি অফিসে আছে।'

—তাকে স্কুলে পাব? বনা বললে।

—আপনার কি মাথা খারাপ হোল। স্কুলে যাবার সময় আছে তার? হয়তো এস. ডি. ও. অফিসে অথবা অন্য কোথাও ব্যস্ত আছে। একটু দেখে নিন।

বনার খুব ইচ্ছে অবনের বউ অন্তত পক্ষে একগ্লাস নুন-চিনির সরবত করে দেবে। খুব তেষ্টা পাচ্ছিল তার। সে ইঙ্গিত করলো 'টিউবওয়েলটা কি খারাপ হয়ে গেছে?' অবনের বউ ইঙ্গিত বুঝতে না চেয়েই বললো 'এখানে তো টিউবওয়েল নেই। ওটা তো ওঠে গিয়ে এখন সব ট্যাপকল হয়েছে।' অবনের বউ কি তবে এখন সেরকম আন্তরিক নেই নাকি অবনের সঙ্গে গণ্ডগোল? একগ্লাস জল কি তবে চাইব? 'ভিক্ষের দরকার নেই ভাই, কুকুর ডেকে নে তোর।' বনা মনে মনে ভাবে 'হায়রে অবনের বউ, তুই এত বদলে গেলি?' ওর আজ কি শরীর খারাপ, বন্যাকে যে চিনতেই পারল না। অথচ ওদের দু'জনকে মেলাবার জন্য কম পরিশ্রম করেনি বনা। যাগগে, ওসব ভাবনা ছেড়েই বনা এস. ডি. ও অফিসে গেল। সেখানে পাওয়া গেল না। পার্টি অফিসে পেলো না। ময়রার মিষ্টি দোকানে নেই। শ্রমিক দপ্তরে নেই। কোথায় ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে কে জানে। বিরক্ত হয়ে সে মৃদু গালি দেয়। 'শালা আমার কাজের বেলায় পাওয়া যাবে কি? নেতা তো নয় নেতার হাতা। জো হুজুর। নিজে চাকরী ম্যানেজ করেছে! বউ-এর

চাকরী ম্যানেজ করেছে। ভাইপোর ম্যানেজ হবে। বাড়ী করবার ধান্দায় এবার বুঝি আছে।' বনা আরো বিরক্ত হয় এইসব ভেবে। কিন্তু সাহসও হয় যে অবন তাকে এই সুযোগটা দেবেই। এই ভয়ঙ্কর রোদে সাঁতার কেটে অবশেষে ক্লান্ত বনা অবনকে আবিষ্কার করলো ব্যাংকের দুয়ারে।

—ওঃ বাঁচালে। তোমাকে খুঁজে খুঁজে মরে গেলুম। সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা স্ট্যাণ্ড করলো। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলো বনা।

—ব্যাংকে কাজ ছিল। অবন মৃদু হেসে বললো। 'ডেপুটেশনই প্রায়, ব্যাংকে ম্যানেজারের সঙ্গে।'

—ডেপুটেশন না ছাই। নিজের এ্যাকাউন্টের কাজে এসেছ বাবা, অত উলটো বলছ কেন? বনা কি জানেনি অবন নিশি? একটু মজা করলো বনাও।

এখন আর তেমন করে মজা করা হয়নি কারো। মজা করতে ভালও লাগে না। বয়েস তো আটত্রিশ পার করেছে সে। যদিও অবন তার চেয়ে বয়সে ছোট। ছোটই। ব্যাংকের দুয়ারে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি সব কথা বলে বনা। অবন এ খবর জানতো না। অবন এই খবর পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হোল। কিন্তু বনা সে আহ্লাদের খবর রাখল না। বুঝতেও পারল না।

বনা বলল এটা ভাই আমার জন্যে তোমাকে করতেই হবে। আমার ভীষণ দরকার। বি. এম. সহযোগিতা করবেন। তুমি যদি একটু পার্টি নেতৃত্বকে বলে দাও তাহলেই হবে।

—'দেখ আমাদের কিছু করবার হাত নেই।' অবন ঠোঁট কুঁচকে বললো।

বনা বললো, 'তুমি শাসক দলের নেতৃত্ব। তোমাদের কথাই গুরুত্ব পাবে। তুমি একটু সহযোগিতা করো। মাইরী।'

বনার আবার মনে পড়ে 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু'। স্ত্রী ও রাজনীতির লোকদের বিশ্বাস নেই। তবুও তার কণ্ঠে ব্যগ্রতা ছড়ালো।

বনার এই ব্যগ্রতা দেখে অবনের আগ্রহে কোন খামতি দেখলো না। বৃষ্টি এলে সমগ্র বৃক্ষরাজি যেমনি মাথা নত করে প্রকৃতিকে নমস্কার করে, নদী যেমন সমস্ত জল সমুদ্রকে সমর্পণ করবার আগে একবার নত হয় তেমন অবনও যেন বনার এই প্রস্তাব শুনে ভালবাসায় নত হোল। সে বনাকে একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বললে 'ঠিক আছে বনা, তোমার ব্যাপারটা আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি নিশ্চিত থাকো।'

বৃক্ষের ফল যেমন তার ভার নিয়ে বৃক্ষে নিশ্চিন্তে ঝোলে সেরকম নিশ্চিন্ত হোলো বনা। অবনের এই কথায় বনা এত বেশী আশ্বস্ত হোল যে কোন চিন্তার অবকাশই থাকলো না। বনা বললো 'চা খাবে তুমি'। অবন বললো 'না', 'তুমি পরে দেখা কর।' বনা যখন ফিরল তখন গুনগুন করে গাইছিলে 'পার করো আমারে'।

অবনের যে কৃতজ্ঞতা বনার প্রতি নেই তা নয়। সেই কৃতজ্ঞতা অবশ্যই আছে। কিন্তু

ঋতুর প্রতি তার দুর্বলতাও তো কম নেই।' ঋতুর কথা সে এড়াবে কেমন করে। ঋতু তার ক্লাসমেট নয়। রাজনীতির সঙ্গী নয়। ইদানীং ঋতু তার সাথে কথা বলে। বন্ধুত্ব করে। একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব ঋতু তার প্রায় সমবয়সী বন্ধুর মতো। ঋতু নারী। তার প্রকৃতিদত্ত স্বভাবসিদ্ধ কোমলতায় অবনের সম্মোহন হয়ে যায়। যারা প্রেম পছন্দ করে তাদের মধ্যেই কি সম্মোহিত হওয়া বা সম্মোহিত করার প্রবণতা তীব্র হয়! তাই ঋতুর কাছে যেন অবন একটু বেশী বশীভূত। তথাকথিত ভদ্রতা ছাড়া অবনের দেবার কিছু নেই, কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়েরা এই ভদ্রতাকে আশ্রয় করেই ছেলেদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য আদায় করে নিতে পারে। আর প্রায় ছেলেরা একটি নারীর সামনে তার বৃত্তকে কঠোর করতে পারেনি বলে অবনের মতো ছেলেরা সাময়িক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

ঋতু বলল 'একটা প্রস্তাব আছে অবনদা। আপনি অভয় দিলে বলব।' গলায় মোহ ছড়িয়ে উচ্চারণ করল ঋতু। অবনের মনে হোলো এত সুন্দর করে অন্য কোন মেয়ে কখনো বলেনি তো। কেন? আগ্রহের সঙ্গে বললো 'আপনি একবার আমাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় আসুন, খুবই জরুরী কথা আছে। ঋতুর চোখেমুখে এই প্রসন্নতা এত উজ্জ্বল আলোর মালা অবন আগে কখনো দেখেনি। এখানে প্রেম নেই, যারা প্রেম খুঁজবে তারা ভুল করবে কিন্তু একটা অস্বাভাবিক আন্তরিক ভদ্রতার কাছে অবন যেন নিজেকে লেপটে ফেলছে। 'কি করে যাব বলো, জরুরী সভা আছে যে দু'টো। পারবো না তো ভাই।'

বাতাস বন্ধ হলেও গাছের ফুলেরা যেমন তার গন্ধকে এলিয়ে দিয়ে নিজে প্রাণপণে বিকশিত হয়ে অন্যকে মোহিত করে তেমনি করেই যেন ঋতু বলল 'অবনদা আমি আপনার পার্টি কর্মী নাই বা হলাম, আপনি আসুন না ভাই। পার্টির বাইরের লোকদেরও তো দরকার।'

ঘামে আলো কম। আলোর বিকাশ নেই তত। আঁধারের কানা ঘুঁজি হেথায়। কাকভোর তবুও বা আছে কিন্তু ঠিক ঋতুদের পথে বুঝ্‌কো আঁধার নেই। তাই এই আলো গায়ে মেখেই ঠিক সন্ধ্যায় পনর মিনিটের জন্যে ঋতুর বাড়ী গেল। ডোর বেলটা টিপতেই দোতলার একটা কোণ থেকে পাখী ডাকের শব্দ হ'ল। কালো একটা বিদেশী কুকুর ঝমঝম করে চিৎকার করলো। ঋতু একটি পরিচ্ছন্ন আটপৌরে শাড়ী পরে নেমে এলো খুব দ্রুত। দরজার ভেতর থেকে বললো 'অবনদা?'

অবন বলল 'খোলো, একদম সময় নেই ভাই।'

'আপনাকে এককাপ কফি খাইয়ে ছেড়ে দেবো আসুন।' ঋতুর পা ফেলাটাও যেন ছন্দের মতো। অবন একবার ভাবলো তার বউ কেন এমন স্টেপিং করে না? এই সন্ধ্যা যেন গুলতানি পাকিয়ে ফেলবে অবনের। অবন বললো 'বাবা আছেন? মা কোথায়?'

'ওরা আছেন, আসুন।'

একটি পরিচ্ছন্ন ঘর। ওদিকে বই। বইয়ের তাক তার ডিগি তবলা। এদিকে খাট আর সাজানো বিছানা। সামনে রঙিন টিভি। প্রশস্ত টেবিলে চেয়ারে একটা আশ্চর্য আভিজাত্য বিরাজ করছে। প্রচুর টাকা নেই। কিন্তু অদ্ভুত রুচি আছে এদের।

কোন রকমের আড়ষ্টতা না রেখেই অবন বলল, 'বলো ঋতু অনেকটা দেরী হয়ে গেল।'

মা-বাবা সবার সামনে ঋতু এত সুন্দর এত মোহ ছড়িয়ে কথাগুলো উপস্থাপন করলো যে তার কথার বিরুদ্ধে অবন যাবে এরকম নিজস্বতা বজায় রাখতে পারল না। একটা আস্ত অজগর যেমন বিশাল একটা গরুর বাচ্চাকে অতি সহজে অবলীলায় ধীরে ধীরে গিলে ফেলে, ঠিক তেমনি করেও ওদের সমগ্র আন্তরিকতায় গেলা হয়ে যাচ্ছিল অবন। কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবলো 'আমরাও চাকরী করি দু'জনেই তবে ও কেন এত কেয়ারলেশ।' অবনের কি সম্মোহন হোল। ঋতুর বাবা-মার কাছে অদ্ভুত বিনয়ী হয়ে গেল অবন।

ঋতু ঠিক তেমন করে বললো, 'অবনদা, জয় আমাদের কেউ নয়। ভাই নয় বন্ধু নয়, শত্রু নয়—সে আমাদের প্রতিবেশী। গরীব এবং বেকার প্রতিবেশী। এর ভাই বন্ধু কেউ নেই। আমরাই সব।'

অবন বলে কেন ওর দাদারা চাকরী করে। অবস্থাপন্ন। তারা আমাদের সমিতির লোক।

ঋতু বলে 'ভাই রাজা তো আমার কি? সে যাক। বীমা অফিসে একটা দিনমজুরীর কাজ খালি আছে, সেটার ব্যাপারে পার্টির সুপারিশ থাকবে। প্লিজ জয়কে এই কাজটা দিতেই হবে।'

ঋতু আরো অনেক কথা বলল। পনের মিনিট নয়, অনেক মিনিট খরচ হয়ে গেল তার। তবুও পরের প্রোগ্রামের জন্য তাড়া তেমন রইল না।

তারপর অনেক কথা। অনেক আলোচনা। অনেক অতীত। অনেক হৃম্বিতম্বির সহজ গল্প হোল। ঋতু হাসলো। ঋতু যেন লুটিয়ে পড়লো আহ্লাদে। অবন যে ঘরে জন্মেছে, যে ঘরে বেড়েছে, যে ঘরে আপাতত রয়েছে সেখানেও যেন এত অভিজাত সখ্যতা এত সান্ধ্য আন্তরিক অভিনন্দন এর আগে কখনো পায়নি। অবনের বউ কি তবে এত কিছু জানে না। সে যেন কত গ্রাম্য। অবন আশ্চর্য হয় ঋতুর সেই ব্যক্তিত্বের সামনে। অবন নিশি বনার কথাটা কেন উচ্চারণ করতেই পারল না। কেমন অসাড় পঙ্গু মেরুদণ্ডহীন হয়ে নির্লজ্জ সন্ধ্যায় সে আত্মসমর্পণ করে বললো, ঠিক আছে হবে।

বনা পরের দিন দেখা করতেই অবন একটা চিঠি লিখে পাঠালো তার নেতৃত্বকে। অবন জানে এটা দরকার নেই। এটা ব্যক্তিগত সুপারিশেই হতে পারে। তবুও নেতৃত্বের কাছে পাঠালো। বনা ভাবলো খুবই জরুরী। একবার হেথা অন্যবার হোথা। শুধু বনার কাজেই নয় অন্য কাজেও। সর্বত্রই পাঠালো তাকে। এই ক'দিন যেন বনা তার পেড

সারভেন্ট হয়ে গেছে। বনা ক'দিন বাজারটাও ঘরে পৌঁছে দিয়ে এলো। বনা অবনকে বললে 'তুমি কথা বলেছো? আমাকে কি করতে হবে?' 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করো। উনি তো তা'কই দায়িত্ব দিয়েছেন?' অবন দ্বিধায় পড়ে। অবন এড়িয়ে চলে, চাতুরী করে বনা, বিশ্বাস করে তাকে। সে নেতা। আর যাই হোক বনা তো তার সঙ্গীও। বহুদিনের। ঘামে বনা-অবন অনেকদিন তো জুটি। অবন জানে গুড়িয়ে গাড়িয়ে বার তেরশ টাকার বেশী আয় করতে পারেনি বনা। বনার একটু মুখ কম। তাই বনা সবটা বলতে পারে না। চাইতেও পারে না। অবন অবশ্য নিজের স্বার্থটা যেমনভাবে অন্যেরটা তেমন করে ভাবে না। এটার জন্য অবন একা দায়ী নয়। এটা মনুষ্য জাতির স্বভাব, সে 'অয়মনিজ্পরোবেতি' তাই বনাকে সুপারিশ করা মানে নিজের ক্ষতি।

অবন নিজে প্রাইমারীর মাষ্টার। আটচালায় বসে। বাচ্চারা বিরক্ত করে। 'মাষ্টারমশায় হাগব' 'মাষ্টারমশায় মারছে' কত কী বিরক্তির অভিযোগ তাকে শুনতে হয়। কিন্তু বনা যখন স্থায়ী হবে তখন সে হবে সর্বভারতীয় অফিসের কর্মী। অবনের এই ভাবনাটা পেয়ে বসলো। কিন্তু বনাকে সে কি বলবে?

মাসখানেক পরে বনা জিগ্যেস করতেই বললো 'আজ সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। নেতারা সবাই ছিলেন। আমি ভাই একা নই সবাই ছিলেন।'

বনার যেন গা থেকে জ্বর ছাড়লো, এতদিনের দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান হোল। আজ সে খুব মজা করবে। খুব আনন্দ হোল তার। অবন তাকে অন্য কিছু বলল না।

ইতিমধ্যে সর্বত্র যোগাযোগ দরখাস্ত ইত্যাদি সব দিয়ে দিয়েছে বনা। ইণ্টারভিউ-এর পর বি. এম. বললেন 'অবনবাবু আপনার পক্ষে এখন চিন্তার কি আছে।' বনা যেন কৃতজ্ঞতায় অবনের আরো কাজ করে দিতে চাইলো। আবেগে উচ্ছাশায় বনা নিজেকে স্থির রাখতে পারলো না।

ইণ্টারভিউ বলতে তেমন কিছু নয়। ডেকেই জিগ্যেস করা হোলো পৃথকভাবে। বনা জানে না তার প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছে কি না। জানবার চেষ্টাও করেনি। অবন নিশি যার বন্ধু তার আবার ভাবনা কি। সুতরাং 'পার করো হে আমারে' এই আর্তনাদ তার তো করবার কথা নয়। বনা নিশ্চিন্তে থাকবে।

মাঝখানে ক'দিন ছিল না বনা। তার কোন মামাতো ভাইয়ের মেয়ে বিষ খেয়েছে সেই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। প্রায় বিধ্বস্ত বনা যখন অফিসে এলো সেদিন পয়লা শ্রাবণ। বেশ মোলায়েম আর প্রসন্ন পরিবেশ।

নিজের সীটে বসতেই ডি. ও. বললেন 'কী হে, বন্ধু তোমার কি করল?'

বনা বুঝতে পারল না। প্রায় উদাসীন ভাবেই বললো 'কেন'?

—যাও, দেখো গে কে জয়েন করেছে।

'অসম্ভব'। বনা প্রত্যয় নিয়ে বললো।

—'যাও না, অত বলার কি আছে দেখে এসো।' কথাগুলো যেন তাকে শরবিদ্ধ করলো। চুট্‌কী কেটে বস্ বললো 'আরে দরকার কী চাকরীর। দেশ দেখবে কে?'

সোজা উপরে উঠে গেল বনা। জয়কে দেখলো সে। কিন্তু কাউকে কিছু বুঝতে দিলো না। প্রচণ্ড আত্মসম্মানে লাগলো তার। যার আত্মসম্মান নেই, সে তো মানুষ হতে পারে না। তাই সে তার জায়গায় নিজেকে সংযত রাখল।

সোজা বি. এম.-এর কাছে যেতেই বি. এম. বললে 'সরি বনা। আমি পারলাম না। তুমি যে বললে অবন নিশি তোমার বন্ধু, তবে সে তোমার বিরুদ্ধে বলল কেন?'

একথার উত্তর না দিয়ে বনা বললে 'আচ্ছা এটা কি পার্টির সিদ্ধান্ত ছিল।'

বি. এম. বললে 'ধূর ভাই। পার্টির কোন ব্যাপারই নেই।' অবনবাবু বললেন, 'তার কথা অমান্য করিনি।'

সময়টা পার করে এসে আর একটা পারে এসে দাঁড়ালো বনা। একটা নিশ্চিন্ত জীবনে আরোহণের লোভ থেকে পার পেয়ে গেলো সে। একটুও তার ভয় লাগলো না। বুকে একটা অদ্ভুত সাহস জন্মালো, যেন সে অগণিত মানুষের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করে বাঁচার জন্য তৈরী কিন্তু অবন নিশি, যে কিনা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে প্রতারণা করে গেল সে কি পার পেয়ে যাবে? তারা কি পার পেতেই থাকবে?

বনার ঘেন্না হোল অবনের ওপর। ভীরু কাপুরুষ অসত্য আর প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ভাঁড়ামী করে চলেছে সে, তার প্রতি বনার কোন দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব থাকতে পারে না। সে যেন একটা সত্যের পারে এসে দাঁড়ালো অবলীলায়।

ক'দিন পরে হঠাৎ অবন নিশি বনাকে দশ-পনেরটা লোকের সামনে ডাকলো 'বনা'। বনা ধীর স্থির ভাবে তার সামনে এসে দাঁড়ালো। অত্যন্ত ঋজু আর শ্লেষ মিশ্রিত ঘৃণায় স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অবনকে বললো, 'অবন তুই মিথ্যেবাদী, অসৎ—ছোটলোক, নোংরা তোর পাশে থাকা পাপ।' বলেই সে অভাবের অহংকার নিয়ে চলে গেল।

অবিনাশ

নিয়ত কত আর যুদ্ধ করা যায়। কতভাবে যুদ্ধ করতে হয় অবিনাশকে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। পড়শীর সঙ্গে। হাটেবাজারে দোকানে পার্টিতে মাঠে-ঘাটে সাপ ব্যাঙ কুত্তা শেয়াল সিংহ আরশোলা কচ্ছপ খরগোস গ্যাঁড়া লম্বা মোটা সরু হুত্কোর কতরকমের যুদ্ধ। কিন্তু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তার শান্তি বেশী। জিতেছে সেখানেই। তার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, সে যে যুদ্ধ করেছে সেই যুদ্ধে বিবেকের দায় নেই। বিবেকের পীড়ন নেই। লোকে তাকে ভুল বোঝে বাজে কথা বলে প্রশংসাও করে কিন্তু তার সমস্ত কাজে বিবেকের দারুণ কারুকাজ। ঘুমিয়ে সে ভীষণ আরাম পায়। সে কাউকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে না। তার বিবেক যা প্রশ্রয় দেয় তার কাছ থেকে সে নত হয়। প্রশংসা পেতেই হবে এরকম দায় তার নেই। বয়ে গেছে তার।

সে বলে 'জুটলে খাই, না জুটলে হাওয়া খাই।'

অবিনাশ কমিউনিস্ট লোক। সেই কবে ছোটবেলায় দারিদ্রের মধ্যে জন্মে দারিদ্রকে দেখেছিল। ভুগেছিল। প্রতিবেশীরাও ছিল একইরকম। কলেজে পড়বার সময় সে কমিউনিস্টদের কথা শুনেছিল। বলেছিল তারা বিপ্লব করবে। অদ্ভুত এক সমবেদনা। সে অনুভব করেছিল। কারো কষ্টের সঙ্গে কাউকে মিশিয়ে দিতে দেখেছে সে। দেশের লোকেরা দুধ পেতো না বলে চা'তে দুধ খেতো না তাদের কেউ কেউ। ব্যক্তিগত জীবনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কমিউনিস্টদের খাতায় নাম লিখিয়ে জীবনটাকে 'জয় মা বলে ভাসা তরী' করতো।

না বিয়ে না বউ না নারী না সম্পদ না বাড়ী না গাড়ী, এক অদ্ভুত দেশপ্রেমের জন্যে বাজী খেলতে দেখেছে সে তাদের। শ্রেণীসংগ্রামের যুদ্ধে বিশ্বাস করে হাজার হাজার কাঁচাকচি প্রতিভাবান ছেলেরা নেমেছিল রাস্তায়। তারা সবাই কমিউনিস্ট ছিল। তারা বলেছিল সমস্ত মানুষের জন্যে সূর্যের আলো সমান করে দেবে। মেঘের বৃষ্টিকে প্রয়োজন ভিত্তিক পাঠিয়ে দেবে ঘরে ঘরে। আকাশের মেঘমণ্ডলী জলভারে নত থাকবে সর্বক্ষণ দেশের মাটি ফলবতী মায়ের মত ফলবান থাকবে। নদীর গালে থাপ্পড় কষিয়ে বলবে 'দে বিদ্যুৎ দে' আর সেই আলোয় আলোকিত হবে গ্রাম-শহরের ঘরগুলি। তারা বলতো 'একটা লোকও না খেতে পেয়ে মরবে না। বীজ শস্যে ভরে যাবে ভাঁড়ার। সমাজবিরোধীদের স্রোতে ফিরিয়ে আনবে। আর সেই হাঙরেরা যারা সর্বস্ব খায় তারা তৃণভোজীতে রূপান্তর হবে যেমন করে পরিবর্তন হয় মানুষ গাছ পাতা নদী ঠিক তেমন করেই রূপান্তর হবে এবার।'

এই আকর্ষণেই অবিনাশও কমিউনিস্ট। কিন্তু কমিউনিস্টরা এক নয়। তারা বহুধাবিভক্ত।' যেন ঈশ্বরের দল। ঈশ্বর নামক অলীক কল্পনা নিয়ে নানা গুরু নানাভাবে

ভক্ত সংগ্রহ করে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে করে খাচ্ছে ঠিক তেমন করেই দেশপ্রেমের ব্যাপারীরাও দেশের ভাল করবার জন্য এক একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়ে বহুভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। ধর্মীয় কর্মকর্তারা যেমন ঈশ্বরকে দেখাতে পারেনি, এইসব কমিউনিস্টরাও তেমনভাবে নড়বড়ে সমাজতন্ত্র দেখালেও সাম্যবাদ দেখাতে পারেনি।

অবিনাশ এই বহুধার বিরুদ্ধে। অবিনাশ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মার্কসকে নিয়ে সবাই যেন করে খাচ্ছে। খাবারের কারবারী তারা। তারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে গালি দেয় 'আফিংখোর ধর্মচোর' কিন্তু নিজেরাই 'স্বরচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত' গাওয়া গায়কের মতো মার্কস-এর লকেট টাঙিয়ে 'স্বরচিত মার্কস তত্ত্ব' আওড়িয়ে যাচ্ছে তাতে দেশপ্রেমের তলানি পর্যন্ত নাই তাই ব্যক্তিস্বার্থের হরেক বায়না আর নিজেদের ছড়ি ঘোরানোর বিকৃত রুচি। গণতন্ত্রের দেশ বলে ভারতবর্ষকে কখনো ছাগলের হাতেও ধর্ষিত হতে হচ্ছে। ভাঁড় ভারতবাসী তা সহনশীলতার সঙ্গে দেখছে।

অবিনাশ এসবে বিরক্ত, অপমানিত, লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ। কিন্তু অবিনাশ অবিচল। সে সত্যের মুখোমুখী হতে ভয় পায় না। সে ষাটের দশকের আন্দোলনে খড়ের গাদার আড়ালে লুকিয়ে যে কমিউনিস্টকে ভাতের ফ্যান খেতে দেখেছে, এখন সে হাজার হাজার টাকার সরকারী রিলিফ নিয়ে নেয়। সে এখন প্রচুর টাকার মালিক হয়ে যায়। মহামতি আকবর যেমন হিন্দুর সঙ্গে বিয়ে করে বন্ধুত্বের আড়ালে নারীভোগের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছিলেন, এখন কমিউনিস্টরা জোতদার মহাজন লক্ষপতি কোটীপতির কন্যাকে বিয়ে করে, বন্ধু করে, গ্রুপ করে শ্রেণীসংগ্রামের সরল গণিতকে জটিলতর করে দিচ্ছে। অবিনাশ এসব দেখছে। দেখে প্রলুব্ধ হয়নি, এসবকে ঘৃণা করে। নিজেকে সংযত করে। অবিচল নিষ্ঠায় তার দায়িত্ব পালনে ব্রতী হয় সে।

কমিউনিস্টরা তাদের দলে একটু 'জুজু' রাখে। বড় করে সমালোচনা করলেই 'ড্যাং'। চলে যেতে হবে। ঘাড় নীচু করে দল থেকে বার করে দেবে। ক্রমশ উপরতলা এর শক্ত কাঠামোয় তৈরী। কমিউনিস্টদের কাছে আনুগত্যই শেষ কথা, গণতন্ত্র একটা ভেক টার্ম মাত্র।

অবিনাশ বলেছে 'যা সত্য নয়, যা মিথ্যে, যা অন্যায়, অকল্যাণকর তার প্রতি আনুগত্য দেখানো পাপ। এ পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকব আমি।'

নেতা কমলবাবু বলেছিল 'ওহে অবিনাশ, তুমি কি এতই শক্তিমান যে সমস্ত পাপের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াতে পারবে, সব অন্যায় তুলে ফেলতে পারবে?'

অবিনাশ বলেছে 'না, পারব না কিন্তু সতর্ক থাকব না কেন? কেন সতর্ক করব না? কেন সমর্থন করব?'

কমলবাবু বলেছিলেন 'গোল গর্তে চৌকো জিনিষকে মেলানো যায় না।'

অবিনাশ বলেছিল 'হ্যাঁ ঠিক, তাহলে?'

'তাহলে বুঝতে পারবে।' ব্যস এইটুকুই। যেন ভাব-সম্প্রসারণ কর।

সকাল হবার আগেই একটা প্রচারপত্র বিলি করে দিল পার্টির কর্মীরা। অবিনাশ এই প্রচারপত্রের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। টাঁকওয়াল ভূষিদোকানী হাসতে হাসতে একটা প্রচারপত্র অবিনাশের হাতে দিয়ে বলল 'এই লাও।' প্রচারপত্র পড়ে মনটায় একটু বিষণ্ণ বোধ করল অবিনাশ।

সে জিগ্যেস করলে, 'কিছু বলবেনি?'

—'কি আর বলবো বল দিকি। এ তো অনিবার্য। রামায়ণেও ছিল।'

সে বুঝতে পারল না।

অবিনাশ বললো 'বাল্মীকি মুণি রামচন্দ্রের হাতে 'চুল' ছিঁড়ে দিয়েছিল জানিস?'

বললো 'না তো।'

অবিনাশ এককথায় বললো 'লঙ্কাজয়ী রামচন্দ্র যখন রামায়ণের শেষে সীতাকে নেবার জন্যে আগ্রহী হোল ঠিক তখনই সীতা মা বসুধার কোলে চেপে পাতালে গেলেন। সে সময় 'সীতা সীতা' বলে চীৎকার করে সীতার চুল ধরে টানলেও সীতা ফিরে আসেনি। রামের হাতে সীতার একমুঠো চুল রয়ে গিয়েছিল—লো রামা সীতা মাঈকী বাল লো। এটা সেই চুলের মতো।'

ভূষিদোকানী হো হো করে হেসেছিল। হেসেছিল অবিনাশও। বুকে কষ্ট হয়েছিল তার। রাগ হয়েছিল প্রচুর। প্রচারপত্রের প্রচারক নেতার গালে ঠাই করে একটা চড়িয়ে দিলে শান্তি হোত হয়তো বা, কিন্তু সে নিজেকে সংযত করলো।

মণিবাবু সোডায় জামা-কাপড় কাচে। দৈনিক দাড়ি সেভ করে না। পরিচ্ছন্ন রাখে কাপড়-চোপড়। ইদানীং আর ছেঁড়া কাপড় পড়ে না। তার নেশা বলতে কিছু নেই একটু 'দক্তার বাঈ' বেশী। সারাদিনের অনেকগুলি দক্তা পান তার গালে থাকে। দক্তা পান নিয়ে তার বউ তাকে যাতে বিরক্ত না করে সেজন্যে তার বৌকেও সে দক্তার নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। কবে সে তার বাবাকে হারিয়েছে সে জানে না, মনে নেই তার। তার মা মারা গেলেন এই সেদিন। মা মারা গেলে কার না কষ্ট হয়। আবার মা যদি দড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করেন। মণিবাবুর এখানটায় একটু খচ্ খচ্ করে। তিনি স্থানীয় নেতা। নেতার মা আত্মহত্যা করেছে এটা শুনতেও লজ্জা। তা হোক মানুষের স্মৃতি তো দুর্বল কতদিন সে আর ধরে রাখবে। তাই খচ্ খচ্ করলেও মণিবাবুর মন মেরামত হয়ে যায়।

অবিনাশ সেদিন মণিবাবুকে বলেছিল—মা মারা গেছেন লাস এখনো দাহ হয়নি দক্তা পান চিবোতে হবে?

খেপ্ চুরাশ মণিবাবু একটু রাগ সামলে বলেছিলেন 'মা তো কারো চিরদিন থাকে না, তাতে দক্তার কি অসুবিধা হোল? কারুর ব্যক্তিগত রুচিটা পার্টির রুচি নয়!' সুযোগ বুঝে অবিনাশ টিপ্পনী কেটে বললো, 'পার্টিতে ব্যক্তিগত ব্যাপারটা থাকে না কোথাও।'

মণিবাবু অবিকৃতভাবে বললো, 'যা ঠিক তা শেখাতে হয়, যা প্রয়োজন তা করতে হয়।'

স্ববিরোধের কথা শুনে মাথা গরম হয়ে গেল অবিনাশের। অবিনাশ একটি পঞ্চায়েতের প্রধান। নিতান্ত 'মুখ্য উড়ে' নয়। প্রতিনিয়ত পড়াশোনা করে সে। পড়াশোনা জানা লোক। কেউ ভুলটাকে ঠিক বললে অবিনাশের মাথা গরম হয়ে যায়। অথচ পার্টির নিয়ম মেনে অবিনাশ মণিবাবুর অধস্তন। মনে মনে বলে 'আহাম্মক'। মায়ের মৃতদেহের সামনে লোকজন, এখানে কোন বিতর্ক ওঠানো একদম ঠিক নয়, জেনেই সে চুপ করে গেল। মনে মনে অনেক রকম ভাবতে থাকলো।

মুখের কথা ফুরাতে না ফুরাতেই কথার উত্তর দেয় অবিনাশ। কথার কারবারি যারা তাদের একটু অসুবিধাই হয়। মণিবাবু একটা 'ধাঙড়ের মতো।' 'ধাঙড়' বলাই ভাল এই কারণে যে নেতৃত্ব হতে গেলে ধী শক্তির দরকার, যে নান্দনিক গুণ থাকার দরকার তা তার নেই। কেবল আনুগত্য তার কমলবাবু নামে নেতৃত্বের উপর। আর ইদানীং নেতৃত্ব তো শুধু অন্ধ আনুগত্য চায়! কি কেন্দ্র কি রাজ্য কি জেলা কি থানা—গ্রাম সর্বত্রই এই আনুগত্য। নেতৃত্ব 'আনুগত্য দেহী' বললে কর্মী বলে 'মাথা লহো!' এই 'মাথা' আর 'আনুগত্য' নিয়েই অবিনাশের দ্বন্দ্ব। অবিনাশ বলে 'আনুগত্য নেতার প্রতি নয়, নীতির প্রতি।' কিন্তু নেতৃত্ব বলেন 'নীতি নয় নেতার প্রতি।' নেতার প্রতি আনুগত্য—এটাই ক্ষতি করে দিচ্ছে দেশের এবং কমিউনিস্টদের। এই ব্যক্তি আনুগত্যের জন্যেই কমিউনিস্টদের মধ্যে এত দল, উপদল। কে নেতা হবে। কে কার বশ হবে। 'মানব কল্যাণই' যদি একমাত্র উদ্দেশ্য তবে এত বিভেদ নিয়ে অনৈক্য নিয়ে দেশের মঙ্গল কবে হবে? সে একমত হতে পারে না তাদের সঙ্গে।

মণিবাবু নেতৃত্বের অর্থাৎ কমলবাবুর মেয়ে সুগতাকে বিয়ে করেছে। মেয়েটি এমনিতেই দেখতে সুন্দরী। লোকজনের চোখ এড়াতে পারে না। গা ঢাকা দিয়ে খুবই মার্জিতভাবে চলাফেরা করে। কিন্তু 'ঘোড়ীর' এক রোগ, দলা খায়। থাকগে।

মণিবাবু স্কুলে অঙ্ক কষতে গেলে গোল্লা পেতো। নিতেও সুবিধা দিতেও সুবিধা। গুণে ভাগে যোগে বিয়োগে গোল্লাকে গোল্লা দিয়ে ব্যবহার করলে এমন অমোঘ উত্তর আর কোথা থেকেও পাওয়া যাবে না। উত্তর গোল্লা, শূন্য। তাই মণিবাবুকে অঙ্ক আকর্ষণ করেনি! কিন্তু এখন অঙ্কটা ভালই বুঝে গেছে সে। কমলবাবুও ঠিক এরকমই। কার সাথে কতটা ব্যবহার করলে ইউনিভার্সিটিতে ভাইকে, স্কুলে ছেলেকে, মেয়েকে সুপারভাইজারে নিয়োগ করা যাবে সে তা জানে। কাঁহাতক বেকার খাটবে। সারা জেলা ঘুরবে, পরিবারে চাকরী নেবে না? সংসার চলবে কি করে? সুতরাং সুগতার চাকরী চাই। 'শ্বশুরমশাই তা ম্যানেজ করেছেন'। সুগতা অঙ্গনওয়াড়ীর চাকরী পেয়েছে। মনোনীত চাকরী। বি. এ. পাশ করে অঙ্গনওয়াড়ী। তাই ভাল। পরে প্রমোশন।

মণিবাবু জানে সুগতার পর সে স্কুলের চাকরীতে ঢুকবে। ঢুকবে তো বটেই। মণিবাবুর 'কচু' । কিছু পারুক না পারুক দু'চার ঘা চাগিয়ে দিতে পারবে সহজেই। মণিবাবুর মগজ মানে গোশালা। গায়ে-গতরে শক্তি আছে। এঁড়েমী করবার মুরোদ আছে। যেহেতু নিজের বোধ তেমন নেই তাই অনুগত থাকে ভীষণভাবে। একদিন একটা চাকরীও হয় তার।

অবিনাশের সঙ্গে প্রায়ই ঝাঁপর ফেলে গণ্ডগোল মণিবাবুর। গোলগ্রামে এত গণ্ডগোল নেই। সুগতার চাকরীর সময় কিছুতেই রাজী নয় অবিনাশ। কেন সুগতা! তার জমিজায়গা আছে। ঘরের বউ। কোন দরকার নেই। বরং মণিবাবু চাকরী করলে আপত্তি নেই। যেখানে দু'বার ফসল হয় সেখানে একমুঠো ভাতের তো অভাব নেই। যাদের ভাতের অভাব নেই তারা আবার চাকরী চাইবে কেন? বিশেষত যারা পার্টি অন্তঃপ্রাণ তাদের তো ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে। তবে সুগতার কেন দরকার। তাছাড়া মণিবাবু নেতা, তার না হয়ে অপেক্ষাকৃত দুঃস্থদের হওয়া দরকার।

নেতৃত্ব কমলবাবু বলেছিল 'তোমার মাথা. পার্টি বিপদে পড়লে কার কাছ থেকে টাকা নেবে। দেবে কারা। পার্টিকর্মীরা কাজ না করলে কে দেবে?'

—'তা বটে!' হাস্যকর যুক্তি মূল বক্তব্য থেকে সরে গেল সে। সরিয়ে দেবার পর আর মণিবাবুর রাগ যেন বেশী হোল। সে ভাবল 'অবিনাশ তাকে সহ্য করতে পারছে না।'

অবিনাশ জানে সহ্য নয়। রাগ নয়। নীতি নির্ধারণের প্রশ্ন যেখানে অপেক্ষাকৃত বিপন্ন দুঃস্থ অসহায় যুবক-যুবতীরা অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছে, তাদের ঘরে কেন চাকরী যাবে না? চাকরী কি তবে বন্দী হবে একটা জায়গায়? 'এটা ভাল নয়।' অবিনাশ বলেছিল।

নেতৃত্ব বলেছিলো 'না হে অবিনাশ, সরকার চালাতে গেলে কমিটিতে নিজের লোককে আসতে দিতে হবে। না হলে কাকে বিশ্বাস করব?'

হেসে ফেলেছিল অবিনাশ। বলেছিল 'কোরাণ পড়াচ্ছেন নাকি যে প্রথমেই বিশ্বাস করতে হবে? সরকার বিশ্বাসে চলে না। যুক্তিতে নীতিতে চলবে, না চললে আন্দোলন লড়াই গণসংগ্রাম, এজন্যেই কমিউনিস্ট পার্টি।'

বিরক্ত হয়েছিল নেতৃত্ব! শক্ত পাথরের টুকরো দিয়ে মন্দিরে আঘাতে করলে যেমন সজোরে ছিটকে যায়, ঠিক তেমন করেই নেতৃত্বের কাছে কথাগুলি কঠোরভাবে লেগে ছিটকে বেরিয়ে এলো।

অবিনাশ জানে 'এ কথার গুরুত্ব ওরা দেবে না. কেননা গুরুত্ব দিলে ওদের স্বার্থে আঘাত লাগবে।' কিন্তু তাই তো নয়, গুরুত্ব পাবার মতো বৃহত্তর ঘটনা তো এখনো আছে। এখনো কিছু কমিউনিস্ট একথা মানে কিন্তু তারা অনেকেই অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আলোকবর্ষ থেকে তাদের ছিটকে দিয়েছে দল। অনেক দূরে। বহু দূরে।

অনালোকিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তারা কিন্তু অবিকৃত। স্বমহিমায় উজ্জ্বল তারা। সেপাই সান্ত্রীর আলোয় আলোকিত নয়। তারা দিতে এসেছিল। নেয়নি। এরা কেবল নেবে। গাণ্ডেমুণ্ডে সেঁটে নেবে।

মণিবাবু সত্যিই বিরক্ত হয়ে যায় অবিনাশকে নিয়ে। প্রায় সমবয়সী একজন গণ-নির্বাচিত, অন্যজন দল-নির্বাচিত। কিন্তু দু'রকম পদ। দু'জনের গুরুত্ব দু'রকম। তাতেও আপত্তি নেই। অবিনাশ দারুণ আনন্দ পায় কাজ করে। দারুণভাবে সময় দেবার চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময় দিতে পারে না। পাবলিক থেকে বিচ্ছিন্ন মণিবাবু বলে 'পাবলিকের মুখে মুত, পার্টি, পার্টি সব। পার্টি থাকলে পাবলিক থাকবে, দল না থাকলে জনগণ থাকে না।' ডোণ্ট কেয়ার তার মনোভাব।

অবিনাশ বলে পাগল 'দল যাবে, আসবে কিন্তু জনগণ কালাপাহাড়' এরা ঠিক থাকবে। বিভিন্ন বাঁকে মোড়ে নদীর মতো বিচিত্র হতে পারে দল, পার্টি না থাকলে পাবলিক থাকবে না এটা হয় না। এরা ঘন অরণ্য যেমন জল-বৃষ্টি দেয় তেমন দাবানল জ্বেলে দিতে পারে। কত দল কতভাবে চলে যাবে কে তার হিসাব রাখবে কে জানে।

মণিবাবু বিরোধীদের একদম সহ্য করতে পারে না। তার মতে 'শালাদের একবার কেলানো দরকার।' সরকারী নীতিকে মান্য ক'রে তারাও যে মাঠে ফলন বাড়ায়, বাস চালায়, সরকারের বিরোধিতা করলেও পঞ্চায়েতের কাজে উপকৃত হয়, তবুও তারা বিরোধী বলে খুশী নয় মণিবাবু। 'শত্রু'। অবিনাশ বলে, 'এরা আমার আত্মীয়। এদেরকেও দরকার।'

নেতৃত্ব কমলবাবুর এসব কথা পছন্দ নয়। এসব বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না তাদের। তারা ঝগড়া মারপিট পছন্দ করে তাই তাদের চেয়ে অবিনাশ তার কার্যক্রমে 'জনগণের চোখের মণি' হয়ে ওঠে। তার আচরণে কথায় ব্যবহারে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নেতৃত্বর এসব পছন্দ নয়। তারা বলে 'ব্যক্তি নয় পার্টিকেই সবার উর্দ্ধে রাখতে হবে। অবিনাশ একথা মানে, কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব। পার্টি সিদ্ধান্ত আন্তরিকভাবে যে প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ সেক্ষেত্রে ব্যক্তি উর্দ্ধে থাকবে কি করে? সোনার পাথরবাটি নয় কি! কোম্পানীকে ভাল হতে হলে প্রোডাক্টকে ভাল হতেই হবে। তাই ব্যক্তি আগে ভাল হলে দল ভাল হবে। হীনমন্য নেতৃত্ব বলে 'না ব্যক্তি নয় দল বড়।'

নেতৃত্ব এসব কথায় অবিনাশকে সহ্য করতে পারে না। একটু পেছন পাকা মনে করে তাকে। তাকে যে সহ্য করা কোনভাবেই যেতে পারে না সেরকমই একটা মানসিকতা তৈরী হয়ে যায়। নেতৃত্বের কাছে অবিনাশ 'ভাতে পড়ল মাছি'।

রাজনীতি তহবিল ছাড়া চলে না। তার বিপুল খরচ। এসবের জন্যে অর্থ সংগ্রহ তার জরুরী। এবং পবিত্র কাজের মধ্যে পড়ে। যে টাকা দেয় তাকে সে তার আদর্শ মনে করে। মাথায় করে নাচে। কেননা টাকাই তার চালিকাশক্তি। আদর্শ তার

বৈঠকখানায়। কদাচারের রসুই হয় তার রান্নাঘরে, ভেতরে। নির্দিষ্ট কোন বিষয় মানে না তারা। তবে কমিউনিষ্টরা ঠিক এতটাই। তাদের কদাচার মাত্রান্তর্গতই আছে। এখনো লিমিটলেস হয়নি, এটাই বাঁচোয়া।

মণিবাবু কোন আলোচনা না করে 'অশ্বত্থ তলা ছাঁদ বাঁধ মেরামত' প্রকল্প থেকে তের হাজার টাকা সরিয়ে হিসেব দিতেই অবিনাশ রেগে আগুন হয়ে গেল। সে 'চুরি' কোন ভাবেই সহ্য করবে না। অডিট করার দায়িত্ব যেহেতু অবিনাশের সুতরাং 'টাকা চুরি', তাকে না জানিয়ে; মাথা ঘুরতে লাগল তার।

মণিবাবু বললে 'আগে পার্টি।'

যেহেতু পার্টিই উন্নয়নের কাজ দেখভাল করে সুতরাং প্রধানকে তেমন বেশী নজর দিতে হয় না। রাগারাগিটা বেড়েছে বলেই অবিনাশ সতর্ক ছিল নিজেই।

মণিবাবু বললে 'টাকা দেবো কি করে পার্টি তহবিলে?'

—তা বলে উন্নয়নের টাকা নষ্ট করে পার্টি তহবিল? অবিনাশ জিগ্যেস করে। মণিবাবু বললে, 'তাতে কি? উন্নয়নের জন্য পার্টিকে তো নষ্ট করতে পারি না। জনগণ কাঁহাতক টাকা দেবে? তাদের কি ট্যাকশাল আছে?'

সত্যিই সর্বদাই হা-হা করলে লোকেই বা কত দেয় অথচ পার্টি চালাতে কত টাকার দরকার। দিন চলতে তো হবেই, সেটা কিভাবে চলে। 'তহবিল মিটিয়েছি জানিয়ে দিলুম,' মণিবাবু বলে। অবিনাশের উভয় সঙ্কট একদিকে টাকা চুরি অন্যদিকে মহান কর্তব্য। শপথের সময় বলেছিল আদর্শের নামে যে সে সৎভাবে কাজ কববে। কিন্তু কি করবে সে?

নেতৃত্ব কমলবাবু ধমকে দিয়ে বলল 'হচ্ছেটা কি অবিনাশ। এসব বন্ধ করো। মণিবাবু যেমন যেমন বলছেন তেমন করো। ন্যাকা'। 'ন্যাকা' কথাটায় ভীষণ আপত্তি অবিনাশের যেন তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক। অবিনাশ মনে করে নেতৃত্ব মানে গাছ। সংসদীয় গণতন্ত্রের ছায়াময় গাছ। এহেন গাছগুলিকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তলীয় গাছপালা থাকে। কেউ পরগাছা, কেউ পরজীবি, কারও শেকড়-বাকড় সুদূরপ্রসারী, কোন গাছ আবার উল্টানো; দু'চারটে ঝুরির উপর নির্ভরশীল, এগুলি ভয়ঙ্কর। এই গাছে আশ্রয়কারীদের ভেংচির মানে বোঝে যারা তারা জানে মণিবাবুর ভেংচির কত দাম। এবং তা কত দামে শোধ করতে হবে। তারা টোকে টোকে থাকে, একদিন গাছগুলিতে আগুন লাগবে। দাবানল জ্বলবে দাউ দাউ।

প্রতিদিনকার মতো ফিডিং সেন্টারের খাবার প্রতিদিন রান্না হয়। আগে ছেলেদের বসিয়ে খাওয়ানো হোত, এখন নাড়ু করে দিয়ে দেওয়া হয়। যখন যেমন খাবার আসে তখন তেমন খাবার রান্না হয়। রাঁধুনী খাবার নেয় বাড়ীর বাচ্চার জন্য, কেউ মনে করে না। মায়ের রান্না খাবারের জন্যে ঘরের ছেলের মন কেমন করে বৈকি, সুগতাও মাঝে

মাঝে রান্না খাবার টিফিন ক্যারিয়ারে নেয়, কেউ আপত্তি করে না। একচাটু খাবারের জন্যে কী এমন যাবে আসবে। কিন্তু পরিচিত 'ঠাকুরপো' বা হাসিঠাট্টার কেউ এলে ঠাট্টা করে বলেই 'বৌদি কি নিয়েছেন?' সুগতা বলে 'একটু নাড়ু আছে, কোলের বাচ্চার জন্যে।'

অবিনাশের কি হঠাৎ মন গেল, সুগতার সঙ্গে দেখা হতেই, বললে 'বৌদি রান্নাবান্না হচ্ছে? দেখি সাপ্লাই ঠিক আছে কিনা?' মুহূর্তের মধ্যে সুগতা কেমন অসাড় হয়ে যায়। কিছু বলা বা বাধা দেবার আগে অবিনাশ হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়েই একটু ভারীবোধ করল। বলল 'এত ভারী কেন, কি রেঁধেছেন গো?' কোন ষড়যন্ত্র না করেই বললো সে। অবিনাশের মনের মধ্যে কোন পাপ নেই। চারদিকে আলু ক্ষেতের সবুজ মহিমার ভেতর সরিষা আর মূলা ফুলের অদ্ভুত সমারোহ দিগন্ত বিস্তার করে রেখেছে। পাশে নদী ক্ষীণ কটি রমণীর মতো পূণ্যতোয়া। তার অস্বচ্ছ জলই ফসলের এই সমারোহ এনে দিয়েছে।

সুগতা বলল, 'অবিনাশদা ছাড়ুন, বেলা হল। তোমার দাদা আবার স্কুল যাবেন।'

—'একি! এ যে ফিডিং সেন্টারের তেল!' ঢাকনা খুলতেই অবিনাশের বিস্ফারিত চোখের আশ্চর্য চমকে সম্মোহন করে দেয় সুগতাকে। দু'জনেই দারুণভাবে নিঃস্তব্ধ থাকে এক মিনিট।

সুগতা বলে 'তোমার দাদা তো সরিষার তেল খায় না, তাই একটু দিয়ে দিল রাঁধুনীদি?'

সঙ্গের রাঁধুনী রেগে বললে, 'কী আমি কখন দিলুম। তুমি এক দু'দিন ছাড়াই ঢেলে আনো। ভয়ে কিছু বলিনি। আমার দোষ দিচ্ছ কেন?' বলেই সে চিৎকার করতে থাকলো। কেননা তার চীৎকার করা ছাড়া অন্য কিছু করবার ছিল না। পথচলতি দু'দশ জন জুটে যাবার আগেই সুগতা বললে না কিছুই, মৃদু হাঁটতে হাঁটতে জটলাকে পেছন করলো।

রাঁধুনী বললো 'আমার কোন দোষ নাই।' বলেই সে কাঁদতে থাকলো। টোকে টোকে যারা ছিল তারা যেন সবাই এসে গেল। খুব স্বাভাবিক কারণেই উৎসাহিত তারা। বাঘ শিকার ধরলে যেমন শেয়াল কুকুর পাখপক্ষী সবাই এঁটোকাঁটা পাবার জন্যে জড়ো হয় তেমন করে উত্তেজনা ছড়ালো পাড়া গ্রাম অঞ্চলেও।

লোকমুখে প্রচার হচ্ছিল মণিবাবুর বৌ সুগতা পর্বের গল্প। কেউ নিন্দা করলো। কেউ বললে ষড়যন্ত্র। বিরোধীরা বললে 'এটা কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র' কেননা মণিবাবুর বউকে নষ্ট করবার জন্যেই এই কায়দা। মাটি কাটতে কাটতে যেমন আবিষ্কার হয় পুরানো সামগ্রী তেমন করেই সুগতার সুন্দরী মুখটার সঙ্গে মণিবাবুর সোয়াবিন তেল খাবার বাঈ মিশিয়ে একাকার কাণ্ড হয়ে গেল।

নেতৃত্ব কমলবাবু কথা শুনতে রাজী হোল না অবিনাশের। পার্টি অফিসের ছোট

কোঠার মধ্যে ঢুকিয়ে তাকে কি বলা হোল না? সহস্র উপমা, ধিক্কার-লাঞ্ছনা-হুঙ্কার সবই করা হোল তাকে।

অবিনাশ বললো 'তাহলে আমি কি করব?'

মণিবাবু বললে, 'কচি খোকা! বলতে পারলে না, মাত্র এটুকু এনেছেন? আচ্ছা এতেই পরীক্ষা হয়ে যাবে? সুগতাকে হেনস্তা করবার কী মানে হয়?'

—'বুঝবার চেষ্টা করুন মণিবাবু।' অবিনাশ বলে।

মণিবাবুকে লোক দেখানো ধমক দিয়ে বাবু বললে 'এসব ঠিক নয়।' খানিকক্ষণ পরে পায়চারি করতে করতে সে ডেকে নিয়ে পিঠ চাপড়ে দেয় মণিবাবুর, 'এত ঘাবড়াবার কি আছে। আচ্ছা যাও। দেখছি।'

ব্যস!

গুরুদেব যেমন ভক্তের সব দোষ মার্জনা করে দয়া করে শিষ্যকে, তেমনি করে নেতৃত্ব মণিবাবুকে বললে 'অবিনাশ ছেলেটা ভাল। কিন্তু কার সঙ্গে মিশে কেন যে ষড়যন্ত্র করে কে জানে?' নেতৃত্ব হিসেব করে দেখলো অবিনাশ সজ্জন তাকে দিয়ে সব কাজ করানো যাবে না, তাই সে তার স্বার্থবিরোধী। কিন্তু মণিবাবুর নিজের মুরোদ নেই, সজ্জনও নয় তাই রাজনীতির তাঁবেদার হওয়া তার পক্ষে খুবই সোজা। একে তাই কাজ করানো খুবই সহজ। নেতৃত্বের কাছে অবিনাশের চেয়ে মণিবাবুর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যায়।

নেতৃত্ব অবিনাশকে বলে 'যত সব ফালতু অপ্রধান দ্বন্দ্ব নিয়ে মাতামাতি ভাল নয়। আমরা এসব একদম পছন্দ করি না।' কথাগুলো এমনভাবে উচ্চারিত হোল যেন মনে হোল, ঘৃণায় অন্নপ্রাশনের ভাতগুলি বের হয়ে আসবে তার। সমাজ পরিবর্তনের নীতিগুলির সঙ্গে সহমত বলেই অবিনাশ এসেছিল এদের কাছে, এটা চায় যারা তাদের কাছেই যাবে সে; এসবের জন্যেই সে নিজের মধ্যে একটা ভাবমূর্তি তৈরী করেছিল। অবিনাশ তো মণিবাবু নয় যে 'মাগ-ভাতার' চাকরী করবে, আবার তেল চুরি করবে। সে সরকারী ক্ষমতার একবিন্দুও তো অপব্যবহার করেনি। ব্যক্তিগত সুবিধার চেষ্টাও করেনি।

তীব্র রাগে ফেটে পড়ে অবিনাশ কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে নেতৃত্ব কমলবাবুকে বলে, 'কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে গাছের পাতারা ঝরে যাবে আপনার কথায়। আপনারা পছন্দ না করলে গাছেরা রঙ বদলাবে, বারণ করলে সূর্য ওঠা বন্ধ হয়ে যাবে, পাখীরা পালক খসিয়ে আপনার খাদ্য হয়ে খাবার টেবিলে জ্যান্ত হয়ে হেঁটে হেঁটে আসবে। আপনি যদি ধমক দিয়ে কুত্তাদের বলেন এই শালা কাপড় পর, ওমনি তারা কাপড় পরে ফেলবে।'

—'এসব কথার মানে কি?' উত্তেজিত মণিবাবু বলে।

—মেয়ে জামাইয়ের স্বার্থ বোঝেন, এসব কথার মানে জানেন না তো রাজনীতি করেন কেন?

—'কি বলছো তার মানে জানো?'

—জানি বৈকি। সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনীতি করেন আপনি। রাজনীতিতে কল্যাণ থাকলেও আপনার নেতৃত্বে কল্যাণের লেশমাত্র নেই। যা আছে তা কল্যাণের ভান মাত্র।

—সেটা কি তোমার কাছে শিখতে হবে?

—সেটা শিখবেন কিনা আপনার ব্যাপার কিন্তু শেখার যোগ্যতা থাকা চাই। সেটাও কি আছে? তবে যোগ্য লোকেরা আপনার সঙ্গে নেই। তাদের আগেই তাড়িয়ে দিয়েছেন, তারাই একদিন সংগঠিত হয়ে আপনার মূলোচ্ছেদ করবেই করবে। কতকগুলো সরকারী রিলিফে পুষ্ট পরজীবি নিয়ে পার্টি চালাচ্ছেন যারা তাদের আবার গরম কিসের। আপনার গরম আপনার ভেতরে রাখুন।

ইতিমধ্যে কয়েকজন জুটে গেছেন, তারাও তারিয়ে তারিয়ে শুনতে ছিলেন বাক-বিতণ্ডাগুলি। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করল না।

অনর্গল বলতে থাকা অবিনাশের মনে হোল তার থামা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল সে। যেন ধবল বক তার প্রসারিত ডানা দু'টি নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিল।

ক্রুদ্ধ নেতৃত্ব অপমানিত হয়ে একটি রা কাটল না।

চব্বিশ ঘণ্টা পার হোল না। অবিনাশের হাতে ভূষিদোকানীর মাধ্যমে এই একটা প্রচারপত্র এলো। তাতে লিখা ছিল 'পার্টি শৃঙ্খলা ভাঙবার জন্য অবিনাশকে বহিষ্কার করা হোল।'

অবিনাশ মনে মনে বললো, 'বাঁচলুম।'

রাইচরণ

খুঁটিতে এক গোছা পাটের আঁশ। একটা ঢেরা নিয়ে রাইচরণ দড়ি পাকাচ্ছিল। কেননা, কালো দামড়াটার চৌদ্দ-হাত লম্বা দড়িটা ছিঁড়ে গিঁট বেঁধে বেঁধে একবারে খাটো হয়ে গেছে। তাই তার বৌ-এর তাগিদেই আজ এই গরমে ঘুমোতে না গিয়ে দড়ি পাকাচ্ছিল রাইচরণ।

জোষ্ঠী মাসের দুপুর। মহা গরম। আঁই-টাঁই করছিল চতুর্দিক। নিতান্ত অসহায় না হলে এই রোদে কেউ নামবে না রাস্তায়। যতই হোক, রোদ্দুরের 'লু' যদি হৃদরোগ এনে 'পটাশ' করে দেয় তবে তো আর নাকালের সীমা নেই। অবশ্য রাইচরণদের কোন ব্যাপারই নাই। তাদের রোদ-ই কি আর মরণই কি! অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন। সেরকমই ব্যাপার।

'রাইচরণ আছো হে।'

কথাটা কানে গেলো। কথাটা আন্দাজ করতে পারলো না। এক মুহূর্তে পরে আবার কে যেন ডাকলো—রাইচরণ আছো হে।

এ্যাই-রে। একটু বিব্রত বোধ করলো রাইচরণ। বুকটা টিপ করে উঠলো। এই তো পরশু দিন বক্না-টা বিক্রী করে ওকে দেড়টা হাজার টাকা দিয়েছি। আবার আজকে এলো। এখন তো আসার কথা নয়। মনে মনে ভাবলো সে। সাড়া দিলে—ক্যাও রতি, মাস্টর?

রতিকান্ত রায়। নবাড় হাইস্কুলের মাষ্টার। বয়েস বত্রিশ-তেত্রিশের বেশী নয়। কালো পারা রঙ। গ্যাঁড়া। হুমদো মুখ। গলার স্বর ফাটা কাঁসীর মতো।

রাইচরণের বয়েস বাহান্ন-তিপান্ন হবে। পাথর কুঁদা রঙ। জিরজিরে শরীর। বিদ্যে নেই। তবে বুদ্ধি খারাপ নয় তার। ইদানীং সই আঁকতে শিখেছে। পাড়ার লোকেরা নিজের নাম, গাঁয়ের নাম, বাবার নাম আঁকা শিখিয়ে গেছে। তারপর থেকেই সে নাম আঁকতে পারে।

মনমরা হয়ে রাইচরণ বলে 'খোলাই আছে, ভেতরে এসো।' আগড়টা ঠেলে মাথাটা একটু নুইয়ে ভিতরে ঢুকলো রতিকান্ত। রোদে আগুনে ঘামে রতিকান্ত একটা আস্ত আধপোড়া মড়াতে রূপান্তর হয়েছে যেন। হাতের ফোমের ব্যাগ থেকে ছোট্ট গামছাটা বের করে চোখ মুখ গলার ঘাম মুছল। গোটা কান পাটিতে সাদা নুন ফুটে গেছে। মুখের ভেতর থেকে একটা রসুন কোয়া ফুঁ শব্দ করে উঠোনে ফেলে দিল রতিকান্ত। বললে, এক গেলাস জল দে রাইচরণ।

রতিকান্তকে দেখে এমনিতেই রাগ হচ্ছিল রাইচরণের। শালা চশমখোর। বাপ বয়সী রাইচরণকে যখন বললো 'জল দে' তখন তার আরো বেশী রাগ হোল। কিন্তু প্রতিবাদ করতে দ্বিধা হোল, কেননা, একে মাষ্টার তায় আবার মহাজন।

ঘটির জলটা ঢক্ ঢক্‌করে গিলে নিলো রতিকান্ত। একটা পিঁড়ে ঠুকে বস্‌লো। ব্যাগ থেকে একটা কাগ্‌জীর-টুকরো বের করে মুখে পুরে দিয়ে চিবিয়ে কয়েক মিনিট আরাম করতে থাকলো যেন। কেউ কোন রা করল না। রাইচরণের চোখ টাটিয়ে গেছলো। রতিকান্ত বললে, বুঝলি কাগ্‌জি নেবু ভীষণ উপকারী।

রতি মাষ্টারের ঘর শহরের পারে তিন কিলোটাক দূরে। এখান থেকে শহর প্রায় আঠার কিলোটাক রাস্তা। পিচ রাস্তা ছেড়ে রাধানগর হয়ে মোটা মোরাম রাস্তা। মোরাম ছেড়ে পঞ্চায়েতের গড়া নতুকের লাল পথ। পথ ভেঙ্গে নদী। নদী ডিঙ্গিয়ে মাঠের বাঁধ রাস্তা। বর্ষার কাদা চটকানো রাস্তার আঁক বাঁক পার হয়ে শীতলা মন্দির। শীতলা মন্দিরের পর চওড়া বলে। খালের উপর সাড়ে তিনখানা বাঁশের তৈরী সাঁকো, সাঁকো পার হয়ে সম্পূর্ণ হাঁটা পথ পনেরো মিনিট। একটা আস্ত গরীব পাড়া। ইদানীং যেন তারা কেউ কেউ উঠে দাঁড়াচ্ছে। একদম ইদানীং।

মাঠের বোরো ধানগুলো সম্পূর্ণ কাটা হয়ে গেছে। যার জমি আছে তার ধান। রাইচরণের তাতে কি। তার গতর আর বলদ ছাড়া সংসারে আর কীই বা আছে। বেল পাকলে কাকের কি।

রাইচরণ বললো, কী ব্যাপার মাস্টার? আবার আজ এই দুখুরে?

—তোর জন্যেই তো আসা। বাকী টাকাটা কি করে দিবি সেটাই তো ভাবনা।

—এই তো টাকা দিলুম। বাকী টাকা মানে?

—যে টাকা দিল তো ক'টা সুদের জন্যে, আসলের টাকা তো একটুও মেটেনি।

—সে কি গো মাস্টর? তুমি এখনো কত পাবে?

—পেলে তো অনেক টাকা পাব। চার হাজার সাতশো বত্রিশ টাকা দিইচি তোকে খালি হাতে। হ্যাণ্ড নোটও লিখিনি। ব্যাংক তো ভিটেটুকুও লিখে নেয়। আমি তাও করিনি। শুধু পঞ্চাইত থেকে তোর টিপ ছাপের পাশে একটা ছাপ্পা মেরেছি। সব হিসেব আছে। ঠকাবার দরকার নেই। সরকার এখন আমাদের ঢেলে দেয়। ঠকাবো কেন?

রাইচরণ বললো, 'ঠকাবার প্রশ্ন লয়। ঠকবার প্রশ্ন।'

রতিকান্ত একটু বিরক্ত হয়ে বললো, 'একথা বলচু কেন? ঠকবার কথা আসে কেমন করে।'

রাইচরণ বললে,' সে তুমি বুঝবে নি মাষ্টর। সংসারে বারজন লোক—সাতজন চাকরী করে। তোমরা ঠকবার লয়। ঠকবো আমরা।

রতিকান্ত আরো একটু বিরক্ত হয়। তার মনোভাবটা এমন—এত কথায় তোর কাজ কি বাবু। অমনি অমনি তো সব হয়নি। পড়াশুনা করেছি। কষ্ট করেছি। মাগনা ধন? সে প্রকাশ্যে বললো, শুনলে তোরও রাগ হবে রাইচরণ। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার দিয়ে

সাড়ে তিন হাজার টাকার মাইনের মাষ্টার আমি। পাঁচ হাজার টাকার গরুর গাড়ী নয় যে টিপছাপ মেরে হবে।

—তা লয়। তা জানি। কিন্তু এইতো তোমাকে টাকা দিলুম। এখন তো দিতে পারব নি। রাইচরণ চিন্তা করে বললো।

রতিকান্ত বললো, আমি বলি কি তোর যে গরুর গাড়ী, গরু আছে তা রেখে কি হবে? সেগুলো বিক্রী করে আমার টাকা মিটিয়ে দে। দৈনিক সুদ বাড়ছে। সুদ তো দিতে হবে। শুধু হাতের সুদ ঘোড়ার চেয়ে বেশী ছুটে। এ সুদের সঙ্গে তোর ছোটা বড় কঠিন। রাইচরণকে এত সুন্দর প্রস্তাব কেউ দিবে নি।

রাইচরণ ভাবলো রতিকান্ত যে কথা বলছে সে কথা মিথ্যে নয়। সুদ সত্যিই বাড়ছে। এত সুদ দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হবে। তখন ঋণ শোধ করা আরো কঠিন হবে। কিন্তু গরু বিক্রী করলে খাবে কি? গাড়ীটা না হয় বিক্রী করা যেতে পারে। কিন্তু তাতেও তো সমাধান নেই। ঋণ তো রয়েই যাবে। কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করতে থাকলো সে।

রতিকান্ত বললো, এত ভাববার কি আছে? আমি কালো করঙার সঙ্গে কথা বলেছি, সে নিতে রাজী আছে। আজ পর্যন্ত যা সুদ আছে তা তো দিলে হবে। দু'দশ টাকা ছাড় রফা করে মিটিয়ে নেওয়া যাবে। আর তুই তো আমার পর নয়। পর ভাবলে শুধু হাতে টাকা দিতুম কি?

রাইচরণ বুঝে ফেলে রতিকান্তর এই 'আপন ভাবনা'টাই হোল ব্যবসা। সে যদি পর ভাবত তবে তো টাকা সুদে দিতে পারত না। সে আপন ভেবেছে বলেই টাকা দিতে পেরেছে। কিন্তু যে সংসার সরকার বদল হবার পর রাতারাতি বদলে ফেলছে নিজেদের এবং একটা নয় অন্তত একই পরিবারের দশ বারোজন লোকের মধ্যে সাতজন চাকরী করার সরকারী সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার টাকা বৈধ পথে এসে গেল। অথচ এ সংসারে এতটা টাকার কোন দরকারেই ছিল না। তাই তাদের টাকা সরকারী ক্ষেত্রে না রেখে বেসরকারী ক্ষেত্রে খাটিয়ে আরো বেশী করে আয় বেড়েছে রতিকান্তর।

মাসে মাসে সুদ মিটিয়েছে রাইচরণ। আসল মিটাতে পারে নি। কোন অসুবিধাও হোতো না। রাইচরণের গরুর গাড়ী ভালই চলছিল। শহর থেকে মালপত্তর বয়ে আনার পক্ষে এই রাস্তায় গোযান ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ট্রাকটরও যেতে পারছিল না, ট্রলি রিক্সাও না।

কিন্তু পঞ্চায়েত এসে যেদিন মোরাম রাস্তা করলো, কাঠের শাঁকো তৈরী করলো, সেদিনই রাইচরণের মৃত্যু-ঘণ্টা বেজেছিল। রাইচরণ অত তলিয়ে দেখেনি।

ওদের পাড়ার কৃষকসভা যেদিন মোরাম রাস্তার দাবী করেছিল, মিছিল করে রাইচরণ সহ সোচ্চার হয়েছিল, সেদিন ভেবেছিল, 'যাঃ বাবা এবার কাদা ঘাঁটাটা যাবে।' সেদিন

কিন্তু রাইচরণ ভাবেনি যে বাঁশটা সম্পূর্ণ রাইচরণের দিকে গেছে, তখন রাইচরণ বড় নিঃস্ব হয়ে গেছে। সে বড় একা বিষণ্ণ অনুভব করে।

রাইচরণ বললো, মাস্‌টর তোমাকে প্রতিমাসে তো সুদেরও টাকা ঠিক ঠিক মিটিয়েছি। কুনা অসুবিধা হয়নি। কিন্তু এখন আমি কি করি বলো দিখি।

কি করি মানে? টাকা তো তোকে দিতে হবে।

কি করে দুব? পঞ্চাইত মোরাম রাস্তায় গরুর গাড়ী চালাতে দেয়নি। পঞ্চাইতের দোষ নাই রাস্তাতো খারাপ হয়। এখন আমি গাড়ী চালাতে পারছি নি। ছ'সাত মাসের মধ্যে গাড়ী চালাতে পারিনি। গাড়ী আটকে দিচ্ছে। পঞ্চাইত, কৃষক সভা সবাই আটকাচ্ছে। রাস্তা খারাপ হয়ে যাবে। তাতে আমি কি করব?

কি করবি তা তো তোকেই ভাবতে হবে। আমি কি ভাববার জন্যে পাট্টা নিইচি?

তা নাও নি। কিন্তু এটাও তো ঠিক যে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এরকম হলে কেউ না দিলেও পার পেতো। কিন্তু তুমি যা চশমখোর তাতে তো এক পয়সায় মরি বাঁচি।

রতিকান্ত তালপাতার আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বললো, গাঁটের পয়সায় তোদের দাঁড় করবার চেষ্টা করেছি। এটা আমার নিজের বুদ্ধি নয় বিদ্যাসাগরকে স্মরণ করেই এটা করেছি। আজকে উপকার পাবার পর তুই একথা বলছিস রাইচরণ? মানুষ এতো ছোট লোক হতে পারে?

এ পাড়ায় রতিকান্ত আট দশ জনকে ধার দিয়েছে। কেউ রিক্সা করেছে, কেউ ছোট্ট নৌকা করেছে, কেউ সাইকেল কিনেছে—প্রত্যেকেই টাকাগুলো ব্যবসায় খাটাচ্ছে। রতিকান্তর প্রচার যে আমার টাকা তোমাকে দিলুম, তুমিও কিছু করার সুযোগ পেলে। আমার টাকাটা পড়ে মার খেলো না। তুমিও কিছু পেলে আমাকেও কিছু দিলে। তার হিসেব বড় সজ্জন হিসেব। তোমার গরুর গাড়ী যদি দৈনিক সত্তর আশি টাকা আয় করে তবে আমাকে দৈনিক তিরিশটা টাকা দেবে না? তোমার তো গতর কিন্তু পুরো টাকাটাই তো আমার। যদি তিরিশ টাকা না দাও অন্ততঃ দিন কুড়ি টাকা তো দিতে পারবে।

রাইচরণের ভাবে, হ্যাঁ দৈনিক কুড়ি টাকা তো ব্যাপার নয়, তারা দিতে পারবে। কাজের সময় না হয় দিলো কিন্তু কাজ যখন থাকবে না তখন কি হবে? তখন চিন্তা নেই; গাড়ী থাকবে রতিকান্তর জিম্মায়। অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তির দায়িত্বে। রাইচরণের হিসাবে গড়বড় হয়ে যায়। অভাব আর কাজ পাবার লোভ তার মাথায় খুন চাপিয়ে দেবার মতই রতিকান্তর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যায়। তাই রতিকান্ত চার হাজার সাতশ বত্রিশ টাকার মাসিক দশ টাকার সুদ অনেক বেশী হয়ে যায়। অঙ্কের মার প্যাচ রাইচরণরা বুঝতে পারেনি। কথার মার প্যাঁচে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে রাইচরণ। তখন রতিকান্তর ঘরের

মুফতের আয় করা টাকা—মাস্টার, প্রফেসর সরকারী কর্মচারীর টাকা সরকারের প্রকল্পে জমা পড়ার চেয়ে রাইচরণদের ঘরে গরুর গাড়ী হয়ে পূর্ণ জন্ম নেয়।

এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতেও যেন রাইচরণের কষ্ট হয়। অনেক টাকা দিয়েও সুদের লাগাম শেষ করে আসলকে ছুঁতেও পারেনি। একবিন্দু টোল খাওয়াতে পারে নি রাইচরণ। তখন সে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কথার টানাটানি চলতে চলতে রোদটা একটু গড়িয়ে যায়। রাইচরণের বৌ হাই ভাঙতে ভাঙতে ঘুম থেকে উঠে। মস্ত চেহারা তার। চকচকে কালো। খাঁটী কালো রঙ। গরীবের ঘরে খুদ কুঁড়ো খেয়ে কি করে যে রাইচরণের বৌ-এর গতর হয়েছে তা দেখে রতিকান্ত একটু অবাক হয়। মনে মনে ভাবে—আমার বউটার যদি এমনি গতর হোত।

চোখ রগড়াতে রগড়াতে দুয়ারে এসেই দেখে রতিকান্ত তার দিকে চেয়ে আছে। রাইচরণের বউ শশীবালার কাপড় পুরোপুরি বিপন্ন ছিল। বুকে কাপড় রাখেনি। তার ঘরের মা-জননীরা বুক খোলা রাখতেই পছন্দ করে। তাদের ঘরের পুরুষেরা তাতে কিছুই মনে করে না। রতিকান্ত সেদিকে কট্ কট্ করে তাকিয়ে বললো, বউদি বুঝি ঘুমোচ্ছিলে? হাই ভেঙে নিজেকে সামলে বললো, হ ভাই কখন আইচ?

—'এসেছি অনেকক্ষণ'।

এরকম দু'চারটে কথা হবার পরে একটা লাল ব্যাগ কাঁধে মাঝবয়েসি লোক রাইচরণকে বললে 'সন্ধ্যায় ইস্কুলে পঞ্চাইতের হিসেব আছে তুমি যাবে।'

রাইচরণ কিছু বললে না। লোকটা একটু উত্তরের অপেক্ষাও করলো না। চলে গেলো।

শশীবালাকে বললো, পঞ্চাইতের হিসাব দিবে; হিসাবের কি বুঝব? কিন্তু আমার হিসাব কে লিবে। তোর পঞ্চাইত যে আমার গাড়ী বন্ধ করল—তার ক্ষতিটা কে দিবে। আমি এবার ঋণ মিটাব কি করে?

শশীবালা কিছু বললো না। রতিকান্ত উঠে দাঁড়ালো। বললো, যাই। বসবনি, রাতে মিটিং আছে একটু দেখি।

রতিকান্ত মাষ্টারের দূরে বাড়ী। কিন্তু যেহেতু সে এ গাঁয়ে কিছু টাকা ধার দিয়েছে তাই রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক ভাল তার। সে নাকি সাংস্কৃতিক মঞ্চের কর্মী। এলিট। বুদ্ধিজীবি বলে দাবীও আছে তার। লোকটার চোদ্দপুরুষ খাঁটি প্রতিক্রিয়াশীল না হলেও বাপটা ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল এই সেদিন পর্যন্ত।

শশীবালা বললো, মাসটর কি বলছে?

গরু বিক্রী করে দে, গাড়ী বিক্রী করে দে। টাকাটা ঝুলিয়ে কি হবে? টাকাটা মিটিয়ে দে।

গরু বিক্রী হবে নি। গরু বিক্রী করলে খাব কি? দশ-বিশটা লাঙলতো এখনো বিক্রী হচ্ছে। ধান কাটার সময়ে তো মাঠে গাড়ীটা চলবে। এখন ওসব বিক্রী করা যাবে নি।

রাইচরণ বলে, পঞ্চাইত অদের বন্ধু। উ কি দেরী করবে?

শশীবালা বলে, কি হবে পরে দেখা যাবে। এখন দেখ না কি হয়।

ক'দিন কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে রাইচরণ ভাবলো সব চুপ-চাপ হয়ে গেছে। আর কিছু হবে না। চিন্তা মাথাতে থাকলেও তেমন মাথাব্যথা ছিল না তাদের।

ক'দিন পরেই সেদিন রোববার। জোষ্ঠি মাসের খর রোদের পর সন্ধ্যায় জমিয়ে দক্ষিণা হাওয়া বইছিল। অন্ধকার ছিল না। আকাশে চাঁদ উঠেছিল। সেদিন কেন চাঁদ উঠেছিল রাইচরণ তা জানত না। শশীবালা সন্ধ্যায় প্রদীপের অভাবে ভাঙা লণ্ঠনটা জ্বেলে সন্তর্পণে তুলসীতলা আর ঘরগুলোয় আলো দেখিয়ে রাইচরণের পাশে এসে বসলো। উঠোনের নীচেই ধূ-ধূ মাঠ। অনেকখানি মাঠ। বিশাল। এক দৌড়ে শেষ করতে পারবে না কেউ হয়তো বা।

মুকুন্দর হাতে একটা টর্চ। সে সটান উঠোনে এসে ডাকলো, রাইকাকা।

ওঃ। রাইচরণ উত্তর দিল।

তোমাকে ইস্কুলে ডাকছে।

কেনে?

চলনা মাস্টারমশায় রতিকান্তবাবু কি অভিযোগ করেছে তাই ডেকেছে।

শশীবালা রতিকান্তর নাম শুনেই গেল খচে। মুখপোড়া মাস্টর আবার রতিকান্তবাবু হইছে। গরুচোর সুদখোর ডিঙরে মাসটর। তুমি একা নয় আমি শুদ্ধু যাব।

রাইচরণ বললে, মিটিঙ তো আগে বলেনি কেনে। ডাকলেই সব হুকুমের চাকর নাকি।

মুকুন্দ বলল, আমি জানিনি বাপু। চল যা বলবার বলবে তাদেরকে।

রাইচরণ বলল, তাই চল যাচ্ছি।

শশীবালা ঘরগুলায় চাবি দিল। ছেলেটাকে বললো তুই বুস। আইচি। লণ্ঠনটা জ্বেলে দিয়ে রাইচরণের সঙ্গে শশীবালা চলল—নবার স্কুলে।

আগে মুকুন্দ, হাতে টর্চ। মাঝখানে রাইচরণ হাতে একটা লণ্ঠন। লণ্ঠনে একটা পাটের দড়ি বাঁধা। শেষে শশীবালা। আদুল গা। কোমরে সায়া নেই। আঁচল দিয়ে গা ঢেকে চলেছে সে।

স্কুল ঘরের মধ্যে মিটিং চলছিল।

মিটিং বলতে কি একটা কমিটি মিটিঙ চলছিল। একটা গ্যাঁড়া মত লোক। কাপড়-পরা। চোখগুলো গুলির মতো ঘুরপাক খায় প্রয়োজনে। ভেতর থেকে বাইরের একটা আলো দেখে লোকটা বললো, কে?

আমি মুকুন্দ। রাইকাকা আর কাকী এসেছে।

ওদের ভেতরে আনো। বসতে দাও। একটা পৃথক বেঞ্চি দেখিয়ে দিলো। রাইচরণ বসলো। শশীবালা বসলো। ঈষৎ লজ্জাবোধ করলেও একটুও ভয় করছিল না তাদের।

রাইচরণ বললো, সব্বচরণে নমস্কার। শিরদাঁড়া নুইয়ে নমস্কার করলো। শশীবালা একই রকমভাবে বললেও তার কথা সবাই শুনতে পেলো না।

গ্যাঁড়া লোকটার দূরেতে ঘর। রাইচরণ চিনে। অনেক দিন ধরে এখানে পার্টী করছে সে। রাইচরণকে তিনি বললেন, চিনতে পারছো।

হ্যাঁ পারি। তুমি তো রতন।

গ্যাঁড়া লোকটার মুখে অকৃত্রিম হাসি ছড়িয়ে পড়ে। রতন তার পরিচিত নাম। মুখে গোঁফদাড়ি নেই। একবিন্দু দাগ নেই। তিনি বললেন, কি ব্যাপার?

রাইচরণ বললে, আমার তো কুন ব্যাপার নেই। কি বলব। মুকুন্দ বললো ডাকছে তাই এলুম।

রতিকান্তবাবু বলুন তো কি ব্যাপার? রতন বললো। রতিকান্ত এই কমিটির অন্যতম নেতৃত্ব। সে বললে, সবই তো বলেছি, নূতন করে বলবার নেই কিছু। আপনারা যা করবেন একটা ফয়সালা করে দিন।

রতন নেতা বললো, 'ঠিক আছে বসুন। আচ্ছা রাইবাবু, রতিকান্তবাবুর টাকা দাওনি কেন?'

কেন দেওয়া যায়নি সেকথা বুঝিয়ে বললো রাইচরণ।

রতিকান্ত বললো, এসব মিথ্যা কথা। অতটাকা আমাকে দেয়নি। তাছাড়া এটা তো সত্যি আমার টাকার প্রয়োজন। বাড়ীতে অনেকেই চাকরী করলেও যে যার পরিবার নিয়ে ব্যস্ত। আমার দলে চাঁদা, অমুক কমিটিতে দান, তমুককে দান এই সব করে কুলিয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া শতাব্দীর সেরা মণীষী নেতার নামে যে বিল্ডিং হচ্ছে সেখানে টাকা দিতে হবে। সেটা দেওয়া দরকার আগেই। রাইচরণের কাছে অতগুলো টাকা পড়ে থাকলে আমার পক্ষে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। তাই আপনাদের বলেছিলুম। আপনারা দেখুন।

অতনু ঘোষ নিজে চাকরী করেন না। ভাই চাকরী করে। বউ অফিসার। বিঘে পনর জমি। ঘর-বাড়ী ভালই আছে। তিনিও দলের নেতৃত্ব। সমাজ পরিবর্তনের জন্য তার মানসিকতার কোন কমতি নেই। তিনি সমস্যাটি বুঝলেন। বছর পঞ্চাশেক বয়েস তার। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, রতিকান্ত ঠিকই বলেছে বাড়ীর জন্যে তার টাকা দেওয়ার অসুবিধাটা যথার্থ।

রতন নেতা বললে, রাইচরণ বাবুকে অনেকদিন মিছিলে দেখিনি। তুমি জমায়েতে নেই কেন?

রাইচরণ মনে মনে বলে, কি খেলুম—কেমন রইলুম কুনদিন তো শালা খোঁজ নাওনি। কেন যাইনি কি বুঝবে বাছা। চুপ করে থাকো।

রতন নেতা আবার বলে রাইচরণবাবু সেবার কৃষক সভার রসিদ কাটেনি। উনির স্ত্রীও তো মহিলা সমিতির রসিদ কাটেনি তাই না?

শশীবালা ট্যাক্ ট্যাক্ করে বলে, রসিদ কাটব কি তোমার ঘরে গিয়ে, ঘরে এলে ত কাটব?

অতনু বলে ঘরে বসে থাকলে সমাজ পরিবর্তন হবে না। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। দে মুকুন্দ উইল্‌স্-এর প্যাকেটটা ছুঁড়ে দে? দু'আঙ্গুলের ডগে ঝকঝকে সিগারেটটা হাসতে লাগলো।

রতিকান্ত দেখলো তার কেনা সিগারেটটা কেমন করে জলের মতো খরচ হচ্ছে।

রতন নেতা বললো, রাইবাবু বল ওর টাকার কি করবে?

কোন ভাবনাচিন্তা ছাড়াই সে বললে, সবই তো বললুম। এখন টাকা দেওয়া যাবে নি। কি করে দুব। গরু বিক্রী করব নি। গাড়ীও বিক্রী করব নি। সুদ দুব নি। ব্যাংকের সুদ দুব। পরে দুব।

রতিকান্ত ভীষণ রেগে গেল। সে ভেবেছিল রতন নেতারা অন্যদের কাছে হাজির হলে রাইচরণ ভড়কে গিয়ে গরু বিক্রী করতে চাইবে। তখন একটা ফয়সালা সহজ হবে। কিন্তু রাইচরণকে একটু শান্ত মনে হতেই সে গাল দিয়ে বসলো, বাপের টাকা রাইচরণ? মাগনা টাকা? আমি কেস করে ছাড়ব।

মুকুন্দ বললো, রতিকান্ত আমাদের দলের সাংস্কৃতিক নেতা। তিনি দলের স্বার্থেই আছেন। তার স্বার্থ রক্ষা করাই আমাদের উচিত।

রতন নেতা বললে, মুকুন্দ ঠিকই বলেছে। রতিকান্ত তার মাইনের টাকা নিয়ে রাইচরণকে সাহায্য করেছে। এটাই বড় কথা। তা বলে এই নয় রতিকান্তর টাকা ইচ্ছে মতো ফেরত দেবে। তা তো হয় না। অত লেবু চোকুটে লাভ কি আছে। রাইচরণবাবু রতিকান্তবাবুর টাকা আগামী সাত দিনের মধ্যে ফেরত দেবে। যদি সাত দিনে ফেরত না দেয় তবে রতিকান্ত গরু বেচে দেবে। তবে হিসেবমতো যা পাওনা হবে রতিকান্ত তার থেকে একহাজার টাকা ছেড়ে দেবে রাইচরণকে।

মুকুন্দ বললো, সাবাস। এইতো রাইবাবুর এক হাজার টাকা আয় হয়ে গেল।

শশীবালা কিছু বলে না। রাইচরণের হাত ধরে উঠে দাঁড়ায়। পথে আসতে আসতে রাইচরণ বলে, বউ তুই তখন কতবার বারণ করেছিস রাত করে ফিরতুম বলে। দৈনিক কাজ কামাই করে মিটিং মিছিল করতুম বলে। সেদিন শুনিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুই ঠিকই বলছিলি।

শশীবালা কিছু বলে না। শুধু শোনে। লণ্ঠনের আলো দাউ দাউ করে জ্বলে, কেননা তখন দু'ঘড়ির চাঁদ ডুবে গেছে। আবার সে নিজের কথাকে নিজেই ভেঙ্গে ফেলে। সে অভিজ্ঞতায় দেখে মানুষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। আমরা যখন মিছিল করেছি, এদের বাপেরা তখন আমাদের বিরুদ্ধে। এরা অনেকেই আমাদের বিরুদ্ধে। মিছিলকে দেখে কুকুরকে 'তু' করতো। মেয়েদের মিছিলে দেখলে গালাগাল করতো। আজ তারাই দেশপ্রেমিক। আমরা ফালতু। রাইচরণ শশীবালাকে বলে শালারা চাকরী করে কাজে

ফাঁকি দিয়ে সরকারের রিলিফ চুরি করে নিজেদের ঘর ভরিয়ে নিয়ে মিছিল দেখাচ্ছে। বলে, যা না শালারা কাজ ছেড়ে কোন সরকারী দান না নিয়ে করনা মিছিল। তখন বুঝবি কত ধানে কত চাল। বলে কিনা, রাইচরণকে মিছিলে দেখিনি।

কিন্তু সাতদিন বাদ দিয়ে তো একটা গণ্ডগোল হবেই। রাইচরণ আজ পর পর ছ'দিন সর্বত্র ঘুরেছে। টাকা ধার করতে চেয়েছে। টাকা পায়নি। একসঙ্গে যার সঙ্গে লড়াই করেচে সেদিন পর্য্যন্তও সেই নেতাকে কথাটা বলবার চেষ্টা করেও তার পাত্তা পেলনা সে। রাইচরণের মনে হোল, ওদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। না হলে সমাজ বিরোধীরা পাত্তা পাচ্ছে কেন?

নবীন পাণ্ডা একসময় মহাজন ছিল। দেশের সব হাঁড়ি কলসী তার ঘরে চলে যেতো। নবীন পাণ্ডার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে একদিন রাইচরণরা জোট বেঁধে ছিল। তাকে শত্রু বানানো হয়েছিল। নবীন পাণ্ডা বললো আমার কাছে টাকা থাকলে রাইচরণ তোকে দিতুম। কিন্তু এখন তো টাকা নেই আমার। তুই প্রধানকে হস্তক্ষেপ করতে বল। সে তোদের দলের লোক, নিশ্চয়ই শুনবে।

রাইচরণ বলে, দলের যেখানে বাড়ী করবার টাকা চাইছে সেখানে আমার দু'টো গরু রক্ষা পাবার নয়। তবুও প্রধানের কাছে গেল রাইচরণ।

প্রধান বললো, সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে গরু বেচে টাকা আদায় করবে। তার বাইরে আমার কিছু বলার নেই।

রাইচরণ যত ঘুরেছে তত তার ক্রোধ মগজে জমেছে। শশীবালাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে। যাদের সঙ্গে এতো দিন ছিল তার দুঃসময়ে তাদের মুখ দেখে ঘৃণায় তীব্র হয়ে উঠেছে। ভয়ঙ্কর দৃঢ়তায় সে অপেক্ষা করছে। সে মনে করছে কোন সত্যই সত্য নয়। সত্যের পরিবর্তন হয়। বাঁচার সত্যকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করে। সংসারের স্যুটেড-বুটেড লোকেরা কতরকমভাবে মানুষকে ঠকিয়ে দিচ্ছে তা উপলব্ধি করে রাইচরণ।

বিকেলে রোদ পড়তেই কালি মণ্ডল তার দু'জন লোক নিয়ে রাইচরণের কাছে এলো। বললো, রতিকান্ত মাষ্টার তোমার গরু দু'টো বিক্রী করে দিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে লিখে দিয়েছে। এই নাও রাইচরণ তার চিঠি আর কেনার রসিদ। তোমার গরু দু'টো নিয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে মজুরদের বললো, যাও গরু দু'টো খুলে আন।

রাইচরণ হাতের কাগজটা দু'হাতে করে ছিঁড়ে ফেলে দিল। শশীবালার উদ্দেশ্যে হেঁকে বললো, বউ হেঁসোটা আন তাড়াতাড়ি। শালারা গরু নিতে এসেছে। একটা শুলা নিয়ে তেড়ে গেল লোক দু'টোর পেছনে। মুহূর্তের মধ্যে পরিবেশটা বদলে গেল। শশীবালা যখন হেঁসো হাতে বেরিয়ে এলো, তখন দেখলো কালী মণ্ডলের লোকগুলো রাস্তা ছেড়ে মাঝ মাঠে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

একাকিনী কুমুদবালা

দু'মাসের ছাগশিশুটি নিয়েই কুমুদবালার যত যন্ত্রণা। সে তাকে ছাড়তেও পারছে না অথচ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে শাসন করতেও পারছে না। সংসারের যত মায়া যত প্রেম যত অভিমান সবটাই যেন ছাগ শিশুর উপর উবুড় হয়েছে তার। সে ছাগশিশুকে নিয়ে গল্প করে, আদর করে তার গা-হাত-পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তার অপত্যস্নেহ যেন তাকে মন্থন করে চলে। কুমুদবালার অবলম্বন বলতে ওই তিনটে ছাগল। দেড় তলা খড়ের চালের বাড়ী। ভাঙা সেলাই মেশিন আর মুড়ি ভাজার দু'টো পুরানো মাটির খলা। তার স্বামী মারা গেছে ক বছর আগে। সে ছিল শিবঠাকুরের বামুন। সারা জীবন শিবঠাকুরের গাজনের সময় সে পুজো করত। সারা বছর সে থাকত কালীঘাটের পাণ্ডা হয়ে। সেখানেই এক চিলতে ঘরে সুন্দরী কুমুদবালা স্বামীকে সাহায্য করবার জন্য দর্জির কাজ শিখেছিল। শায়া ব্লাউজের অর্ডার নিয়ে পাইকারী সেলাই করত। তাতে আট-নয় টাকা যা আসত দিব্যি সংসারের কাজে লেগে যেত। অনেক কষ্ট করেও তাদের কোন সন্তান হয়নি। কত মানত কত চেষ্টা করেছে সে। তবু 'ভগবান' একটা সন্তান দিল না পেটে। তাই তাকে 'বাঁজা' কথাটা কি গাঁ কি শহর সর্বত্রই শুনতে হয়। সুন্দরী অথচ কোন সন্তানের সম্ভাবনা নেই বলে সুযোগসন্ধানী পুরুষ বন্ধুরা তাকে কম নাকাল করেনি। এ ব্যাপারে সারাজীবন ধরে অনেক ঘটনার মুখোমুখী হতে হয়েছে। কোথাও সে নিজের সম্মান নষ্ট করেনি।

আজ সে প্রৌঢ়া। টগর ফুলের মতো তার সাদা চেহারার বাধন দেখে অপেক্ষাকৃত ছোট ছেলেরা তাকে সমীহ করে। কিন্তু সমবয়সী দেখে একটু অন্যরকমই ভাবে। তবে কেউ তাকে অসম্মান করে না। মানুষের মন এত বিচিত্র যে কারো দৃষ্টিনন্দন চেহারার উপর আকর্ষণ হলে মন ব্যক্তিগতভাবে রসিয়ে ওঠে। সে নিজে নিজে নিজের মতো করে কত রকম কি চিন্তা করে।

কুমুদবালা গাঁয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। স্বামী নেই। শহরে বসবাস তার পক্ষে বড় কঠিন। তাছাড়া শিবঠাকুরের যা আছে তা দিয়ে যতটা পায় তারপর কিছু মুড়ি ভেজে দোকানে দিয়ে দু'চারটে ছাগল পুষে হাতখরচ পুষিয়ে কষ্টে সৃষ্টে কোনভাবে চালিয়ে নিতে চায় সে। সেভাবেই সে চালিয়ে নিচ্ছে।

সরকারী নজর এখন গাঁয়ের দিকে পড়েছে। যে গাঁয়ের নেতা ভাল সে গাঁয়ে কাজ হয়েছে সে গাঁয়ে নেতা ভাল নেই সেখানে বাঁদরের বেহালার তার ছেঁড়া হয়ে যাচ্ছে। কুমুদবালার গাঁয়ে বছর কতক আগেও কাজ হয়েছে অনেক। রাস্তাঘাট, হাটবাজার স্কুল-পাঠশালা টিউবওয়েল কত কি হয়েছে কিন্তু দ্বিজদাস নেতা হবার পর গাঁয়ে বিচার নেই, কাজ নেই, শুধু চা দোকানে গুলতানি বেড়েছে, চোর-ডাকাত বেড়েছে। সে যেমন

চিন্তায় অক্ষম তেমন কাজেও অক্ষম নেতা হওয়ার যোগ্যতা তার আছে এরকম বিশ্বাস গাঁয়ের একটা লোকের নেই অথচ সে নেতা।

দ্বিজদাসকে কতবার কত কি সহযোগিতার কথা বলে কুমুদবালা। চাল চেয়েছে, গম চেয়েছে একটু সাহায্য চেয়েও কিন্তু কুমুদবালা কোন সাহায্যেই পায়নি। তাই আর দ্বিজদাসের উপর তার কোন আগ্রহ নেই।

স্কুলের কমিটিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে প্রাঙ্গণে গরু-ছাগল বাঁধা চলবে না। সেখানে নারকেল গাছ লাগানো হয়েছে। নারকেল গাছে কোন বেড়া দেওয়া হয়নি। নোটিশ দেবার পর স্কুল চত্বরে কেউ গরু-ছাগল বাঁধেনি। কিন্তু প্রাঙ্গণটি এত সবুজ হয়ে আছে যে কারো ইচ্ছে করবে একটু গড়িয়ে নিই। বানে ডুববার ভয়ে স্কুলটা থামের উপর দাঁড়িয়ে। স্কুলের পাশেই জমির অফিস। তাদের মাঝখানে অশোক ফুলের গাছ। নীচের এককোণে একজন তান্ত্রিক গৃহী সন্ন্যাসী। গাঁয়ের সবাই না হলেও স্কুল পাড়ার সবাই জেনে গেছে স্কুল প্রাঙ্গণে কারো আসা চলবে না। তাই কেউ এখানে ছাগল বাঁধেনি। কুমুদবালাও না।

কুমুদবালা খুবই সতর্ক। কেননা এই স্কুলের যারা মাষ্টার তারা সবাই পরিচিত। কুমুদকে সবাই ভালবাসে। এই ভালবাসার টানেই হেডমাষ্টার আদ্যনাথবাবুর অন্যরকম কথায় কুমুদবালা সাড়া দেয়নি বলে গায়ে পড়ে ঝগড়া করে মার দিয়েছে তার ছেলেদের দিয়ে। সম্পত্তির গণ্ডগোল হয়েছে। যদিও দ্বিজদাস আদ্যনাথের বিরোধী রাজনীতি করে তবুও দ্বিজদাস আদ্যনাথের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বসে একটা মীমাংসা করে দেয়নি। যতবার কুমুদবালা দ্বিজদাসের সঙ্গে দেখা করেছে এবং সমস্যা বলেছে ততবারই দ্বিজদাস বলেছে 'বিষয়টি ওখেনে নয়। বিষয়টি ভাবতে হবে।' গত ছ'মাসেও খাঁটি নেতা দ্বিজদাসের 'বিষয়টি' ভাবা হয়নি। তাই সব সময় রোজকার মতো আজও কুমুদবালা তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে।

রোজকার মতো আজও কুমুদবালা ছাগলগুলি বেঁধে দিয়ে এল বড় পুকুরের পাড়ে। স্কুলপ্রাঙ্গণ থেকে অনেকটা দূরে। দু'মাসের বাচ্চা ছাগশিশুটিকে আর যাই হোক বাঁধা যায় না। তাই তার মায়ের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে আসে। ছাগশিশুটি নাচে, কুঁদি খায়, ছোটাছুটি করে মায়ের বাঁট চোষে, ব্যা ব্যা করে চীৎকার করে, পিট পিট করে তাকায়। ফুটফুটে কালো ছাগশিশুটি সবার মায়া কাড়ায়। বেশ চমৎকার। স্কুলের প্রাঙ্গণে কেউই আর ছাগল ছাড়ে না, ছাগল ছাড়া হয় বাঁধা হয় দূরে পাল পুকুরের পাড়ে, মাঠে, রাস্তার ধারে। কিছু হাঁড়িদের, বাগদীদের, তাঁতিদের ছাগলগুলো ঘুরতে ঘুরতে স্কুলপ্রাঙ্গণে আসে। টুকে টুকে ঘাস খায়। ঘাস ভয়ে লেপ্টে থাকে মাটিতে আর ছাগল টুক্ টুক্, করে খুঁটে খায়। প্রাঙ্গণে যা ঘাস আছে তাতেই ব্যস্ত তারা। অন্যদিকে তাদের চোখ যায় না। চোখ যেতে পারে না। ছাগলগুলোকে তাড়া করে ছুটে যায় আদ্যনাথের কেয়ারটেকার। সবাই

ছুটে পালায়। ব্যা ব্যা করে ছোটে কিন্তু কুমুদবালার ছাগল ছোটে না। ছুটে পালাতে পারে না। বাচ্চা এখনো ততো বুদ্ধিমান হয়ে উঠেনি। তাই স্কুলের সব ছেলে মিলে কুমুদবালার এই বাচ্চাকে ধরে ফেলে।

ধরা পড়ে বাচ্চাটা চীৎকার করে মুতে ফেলল। ছেলেরা আদর করে তাকে। আদর করতে করতে নির্দেশ মতো খোঁয়াড়ে দিয়ে আসে। খোঁয়াড় মালিক ছেলেদের দু'টা টাকা দেয়। সবাই মিলে ঝালসুটি কিনে খায় তারা। সারা দুপুর খুঁজে খুঁজে হন্যে হল কুমুদবালা। কোথাও ছাগশিশুটিকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুকুর পাড় হোদোতলা, বাগান, পুলধার, স্কুলপ্রাঙ্গণ, বাজারপোড়া—না কোথাও নেই ছাগলটা। না খাওয়া, না তৃষ্ণা, কী ক্লান্ত হয়ে গেছে কুমুদবালা। রোদে ঘুরে লাল হয়ে গেছে মুখ। পঞ্চায়েতের কলে জল দিয়ে চোখমুখ ধোয়। আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। ইতিমধ্যে বার দুই খোঁয়াড়ে দিয়েছিল এরাই। অতিকষ্টে সে ছাড়িয়ে এনেছে। তারপর সে পঞ্চায়েতে ও পার্টিতে জানিয়েছে। দ্বিজদাসকেও জানিয়ে ছিল, কিছু হয়নি।

আঁচল দিয়ে মুখ মুছে দাঁড়াতেই জল পান করতে আসা স্কুলের দু'টো ছাত্র বললে, 'দেখো দেখো তোমার ছাগলটাকে খোঁয়াড়ে দিয়েছে।'

চমকে উঠলো যেন। বললো—'কে অনামুখোরে খোঁয়াড়ে দিয়েছে?' ছেলে দুটি বলল হেড মাষ্টার তাদের বলেছিল। তাই তারাই খোঁয়াড়ে দিয়ে গেছে। সে রাগে ক্রোধে অপমানে কাঠ হয়ে গেল।

ব্যক্তিগত রাগারাগিকে বাড়াবাড়ি করে যখন তখন কুমুদবালার ছাগল খোঁয়াড়ে দেওয়া ঠিক নয়। কাঁদতে লাগলো কুমুদবালা। খোঁয়াড়ে দিয়েছে বলে রাগ নয় কিন্তু খোঁয়াড় থেকে ছাড়াতে সে অর্থদণ্ড লাগে সেই টাকা সে পাবে কোথায়। গেলবারে ধার করেছিল সে টাকাই এখনো শোধ হয়নি। এবার সে কেমন করে টাকা পাবে। নিজেকে সামলে নিয়ে পঞ্চায়েতের অফিসে গেলে দ্বিজদাস স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বললে 'বিষয়টি দেখছি, ভাবতে হবে।' অনেক বিনয় করে কুমুদবালা 'একটু লিখে দাও যাতে ছাগলটা ছেড়ে দেয়' কিন্তু দ্বিজদাসের একই উদাসীনতা দেখে কুমুদবালা বিরক্ত, বিব্রত অসহায় হয়ে হতাশ হয়ে নামতে নামতে বলে 'ঢঙের নেতার মুখে আগুন। করবার যদি মুরোদ নেই বলবার যদি মুরোদ নেই তবে নেতা হইচো কেন'? যদিও কুমুদবালার এটি অন্যায় আবদার তবুও হতাশ হয়ে গাছের গোড়ায় দাঁড়ালো। চোখ মুছলো। পঞ্চায়েতের বিরোধী মেম্বার বিকাশকে দেখতে পেয়ে কুমুদবালা তাকে সব কথা বলল। বিকাশ এমনিতে কম কথা বলে কিন্তু মানবিক গুণ তার প্রখর। স্বাভাবিক ভাবেই সে কয়েকজন লোককে জোগাড় করে আদ্যনাথের স্কুলে গেল এবং অনেক বিতণ্ডার পর খোঁয়াড়ের টাকা আদায় দিতে বাধ্য হল আদ্যনাথ। সেই রৌদ্রে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অভুক্ত অসহায়া হয়ে গ্রামে বেঁচে যেতে পারে এই ধারণা নিয়ে এসে পঞ্চায়েতের উদাসীনতা তাকে হতাশ করলেও বিকাশ যেন তার বুকে আশার সঞ্চার করল।

তখন প্রায় তিনটে। গা হাত থরথর করছিল কুমুদবালার। বাচ্চা ছাগশিশুটি কোলে নিয়ে ফিরছিল সে। ক্ষোভে রাগে বিরক্ত হয়ে মনে হচ্ছিল আদ্যনাথ হেডমাষ্টারকে দেখতে পেলে গাল দেবে। স্কুলের বারান্দায় আদ্যনাথকে দেখে কুমুদবালা গেল রেগে। পাশাপাশি লোকদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলতে থাকলো 'দেখুন, দেখুন আপনারা, আমার দু'মাসের বাচ্চাটা স্কুলের কি এমন নষ্ট করে ফেলেছে।' আরো উচ্চৈস্বরে কত কি বলতে থাকলো।

স্বাভাবিক সহানুভূতি কুমুদবালা আদায় করছে দেখে রাগী আদ্যনাথ স্কুলের বারান্দা থেকেই চীৎকার করে বললে 'ঐ কলকাতার মাগীর কথায় কান দেবেন না।'

কুকুরের মুখের সামনে বেড়াল পড়লে যেমন তেড়ে যায় তেমন করেই ঘুরে দাঁড়ালো কুমুদবালা। 'কলকাতার মাগী' কথাটা শুনে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু বলতে বলতে তেড়ে গেল আদ্যনাথের দিকে কিন্তু সিঁড়ির নীচে সে দাঁড়িয়ে গেল। আদ্যনাথ এক ইস্কুল ছাত্র সহকর্মী পাশাপাশি বিশ পঁচিশ জনের সামনে নিজেকে অপমানিত বোধ করে জামার আস্তিন গুটিয়ে দ্রুত স্কুলের সিঁড়ি থেকে নামতে থাকলো। 'চলে আয় মাগী তোর একদিন কি আমার একদিন।'

—'তুই আমার কি করবিরে ম্যাড়া?' বলেই ছাগশিশুটি কোলে নিয়ে সেও সিঁড়ির উপর উঠতে থাকলো।

কয়েকটা ধাপ উঠতেই আদ্যনাথ কুমুদবালার ছাতি বরাবর ধরে ঠেলে দিল। প্রায় পড়ে যাওয়ার আগে কুমুদবালা নিজেকে সামলে নিয়ে ভীষণ অপমানিত বোধ করল। আদ্যনাথের সহকর্মীরা আদ্যনাথকে টানতে চাইলেও সে আরো যেন মরিয়া হয়ে উঠলো।

কুমুদবালা তারস্বরে চীৎকার করে বলল 'তুই আমার ইজ্জতে হাত দিলি' বলেই সপাটে একটা চড় বসিয়ে দিল আদ্যনাথের গালে।

হাগরী

কথাটার উৎপত্তি কোথা থেকে কে জানে। ছোটবেলায় হরিশঙ্করের মা রাস্তার ধারের ওই লোকগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল 'হাগরী। ওদের হাগরী বলে।' সে অনেক দিন বিশ ত্রিশ বছর আগের কথা। তখন বালক হরিশঙ্কর হাগরী কথার মানে জানতো না। জানার আগ্রহও ছিল না। কথাটির নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য কি এসব নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা ছিল না।

রাতে মায়ের কোলের কাছে শোবার সময় যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তার গায়ে হাত বুলিয়ে গল্প শোনাত। হরিশঙ্কর জিগ্যেস করত 'মা হাগরীদের ঘর নেই কেন?'

তার মা অত বুঝত না। তার কোন বিদ্যেও ছিল না। নিতান্ত বালিকার মতো বেড়ে ওঠা বয়েসে বিয়ে এবং বিয়ের পর অনিবার্য জননীতে রূপান্তর হয়ে 'মা' কথার অর্থও সে জানত না। সুতরাং বালক হরিশঙ্করের কথার উত্তর তার পক্ষে দেওয়া অত সোজা নয়। কিন্তু ছেলে কিছু জিগ্যেস করলেই মা-কে তো তা তার উত্তর দিতেই হবে। তাই সে তার জ্ঞানবুদ্ধি মতো উত্তর দিত। আবার অনেক সময় উত্তর দিতে না পারলে দু'ঘা চাপড়ে তার প্রশ্ন থেকে তাকে নিরস্ত করত।

বালক হরিশঙ্কর আবার জিগ্যেস করেছিল 'হাগরীদের ঘর নেই কেন?'

মা বলেছিল 'ওদের ঘর থাকলে ওরা খাবে কি করে? ওদের জমি-জায়গা নেই। এক জায়গায় থাকলে খেতে পাবে নি। সেইজন্যেই তো ওদের ঘর নেই।'

হরিশঙ্কর বলেছিল 'ওরা কি খায়?'

ওর মা বলেছিল 'ওরা ছোট ছোট ছেলে মেরে খায়।'

বিস্ময় আবিষ্ট বালকের ভেতরে তখন প্রবল উত্তেজনা। তোলপাড় করছিল অলীক কল্পনার বুননগুলো। বললে 'মা, কি করে?' মা বললে 'ওরা লোকের ঘরে ভিক্ষে করতে যায়। ভিক্ষে করতে গেলে যে ঘরে ছোট্ট ছেলে থাকে তাকে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে আসে। ওদের কাছে আছে হাওয়া মন্ত্র। সে মন্ত্র হাওয়ার মতো লাগে ছেলেদের গায়ে মাথায়। তারপর সে হাওয়া হয়ে যায়। ছেলেটি ওদের সোজা ঘরে এসে পৌঁছে যায়। কেউ দেখতে পাবেনি তাকে। তারপর এরা সেই ছেলেটিকে 'চালকুমড়ো হ' বলে খড়ের চালে ফিকে দেয়। তারপর ছেলেটা চালকুমড়োর মতো গড় গড় করে গড়িয়ে পড়ে চাল থেকে। তার কোন জ্ঞান থাকে নি। তখন তাকে তার হাত-পায়ের আঙুলগুলো কেটে বাদ দিয়ে ঘরের কেঁদালে দেড় হাত মাটির তলায় চারঘণ্টা পুঁতে রাখে সন্ধ্যা হলে বের করে এনে বঁটি দিয়ে কেটে পোড়া পিঠের মতো করে কেটে কেটে ঝোল

করে। ঝাল করে। টক করে খায়'। কথা শুনতে শুনতে হরিশঙ্করের গলা কাঠ হয়ে যেতো। তখন আর তার প্রশ্ন করা হোত না, ওদের তো ঘর নেই তবে ওর খড়ের চাল পাবে কোথায়? কোথায় পাবে ঘরের কেঁদাল? কথার ভারে ভয়ে উত্তেজনায় হরিশঙ্কর ত্রস্ত হয়ে যেতো। ঘুমিয়ে পড়তে সে মাকে জড়িয়ে। যখন তার ঘুম ভাঙতো তখন চারদিকে আলো হয়ে গেছে। তখন ভয় থাকতো না আর।

মায়ের এই গল্প হরিশঙ্কর ভুলেছে। হরিশঙ্কর আশ্চর্যভাবে সে কথা কখন ভুলে গেছে জানে না। কিন্তু সত্যিই কি হরিশঙ্কর ভুলেছে। হয়তো কেন, হরিশঙ্করের এসব কথা কি আবছাও মনে নেই?

হরিশঙ্কর একটা কাজে বের হবে বলে পাজামা-পাঞ্জাবী, পরে নিয়ে পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া চটিটা গলিয়ে নিলো। শব্দ হতেই দরজা বাইরে এসে দেখলো একটা দশ-বারো বছরের ছেলে খড়ের একটা কুটো মুখে ঠক্ ঠক্ করে শব্দ করছে। খুঁটিতেই শব্দটা হচ্ছিল। ছেলেটির পোশাক বলতে একটা কাচা কাপড়। গলায় একটা কাঠি ঝোলানো। বাবা-মা মারা গেলে হিন্দুরা যে পোশাক পরে সেই পোশাক। হরিশঙ্কর ছেলেটিকে দেখেই বললে কি হলো রে ঠক্ ঠক্ করছিস কেন?

কুটো মুখে ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। আবার ঠক্ ঠক্ করলো। আবার জিগ্যেস করলো 'কে মরেছে রে তোর?'

ছেলেটি কোন উত্তর দিল না।

হরিশঙ্কর স্বাভাবিক ভাবেই একটু বিরক্তি বোধ করলে। হিন্দুধর্মের গুষ্টির পিণ্ডি চটকে ছেলেটিকে 'একটা থাপ্পড়' মেরে জ্ঞান দেবার উদ্দেশ্যে রাগ প্রকাশ করতেই হরিশঙ্করের বৃদ্ধা মা এসে বললে 'তোর এতে রাগ কেন বাবা। ভিখিরী তার ভেক্ ধরেছে। ওকে ভিক্ষা দিতে হবে। তোর রাগ অন্যকে দেখাগে যা। ওকে নয়, আহা বেচারী।'

ছেলেটাকে চেনা চেনা লাগে হরিশঙ্করের। ওতো প্রায়ই কালনাগিনী নিয়ে পয়সা আদায় করে। ওর আবার বাপ মরলো কবে? হরিশঙ্করের আগ্রহ বেড়ে যায় ছেলেটার উপর।

নানান সামাজিক সূত্রে হরিশঙ্কর বহু মানুষের সঙ্গে কথা বলে। বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করে। খুব সাধারণভাবে মানুষকে গরুর সঙ্গে তুলনা করে খুব একটা পৃথক করতে পারে না।

একদিন এই নিয়ে এক মাষ্টারের সঙ্গে দারুণ রাগারাগি হয়ে গিয়েছিল হরিশঙ্কর বলেছিল 'মানুষ তো গরুর চেয়ে উন্নত নয়।'

মাষ্টার বলেছিল 'তোমাকে ঠাস্ করে চড় মারা উচিত?'

হরিশঙ্কর বলেছিল 'কেন মাষ্টার চড় আমাকে মারবে কেন? আগে নিজের গালে নিজে চড় মারো তবে আমাকে মারবার সাহস দেখিও।'

মাষ্টার লোক জোড় করে বলেছিল 'কেন?'

হরিশঙ্কর হাসতে হাসতে বলেছিল 'গরুদের খাওয়া দেখেছেন? একসঙ্গে একাধিক গরুকে খেতে দিলে কে আগে কত বেশী খেয়ে নিতে পারে সে চেষ্টাই করে। মানুষের প্রবৃত্তিও সেরকম, যতটা পারে ততটাই বেশী কেড়ে কুড়ে নিতে চায়। নেয়ও। তাই এই একটি এই উদাহরণেই গরুকে অতিক্রম করতে পারলো কি?'

মাষ্টার বলেছিল 'না পারে না।'

'জানো মাষ্টার এই শহরেই একটা ইস্কুল আছে। সেথায় ষোল জন শিক্ষক। সে স্কুলের কাজ দেখবার লোক নেই। কেরানী মাত্র একজন। তারপক্ষে সব কাজ করা বড় কঠিন বলে একটা বি. এ. পাশ ছোকরা তের বছর কাজ করছে মাত্র পাঁচশ টাকায়। এই টাকা ইস্কুল দেয়। সেই ছোক্‌রা মাষ্টারদের বেতন গোনে দেয় ষোল হাজার টাকা। একটাকার গণ্ডগোল হলে তার পাঁচশ টাকা থেকে কেটে নেওয়া হয়। গাধার চেয়েও বেশী পরিশ্রম করে ছেলেটি। ছেলেটির ঘরে মা-ভাই-দাদা বৌদি সব আছে, বিয়ের বয়েস ফুরোতে বসেছে। তার পোষ্ট সরকার মঞ্জুর করেনি। তাই সরকারী বেতন পায়নি। কিন্তু চোখের সামনে স্বার্থপর শিক্ষকেরা তার পরিশ্রম দেখেও তাকে সবাই মিলে কি সাহায্য করতে পারতো না প্রতি মাসে?'

শিক্ষক বলেছিল 'কেমন করে সম্ভব।'

হরিশঙ্কর বলেছিল 'যেমন মানুষ অনুকুল ঠাকুরের জন্যে নিয়মিত টাকা তুলে রাখে, ব্যাংকে র‍্যাকারিং ডিপোজিটে নিয়মিত জমা করে, ঠিক তেমন করে ষোল জন শিক্ষক প্রত্যেকে প্রতিমাসে দু'শ টাকা করে ঐ ছেলেটির জন্যে শেয়ার করলে ছেলেটিও তার পারিশ্রমিক পেতো। কিন্তু সেটা তো করেনি।'

—'সেটা করবে কেন?' শিক্ষক বলে।

—'সেটা করবে তার মানবিক আর সামাজিক প্রয়োজনে। তুচ্ছ স্বার্থ বোধ নয়, স্বাভাবিক সমত্ত্ববোধের প্রয়োজনেই তা করতে হবে কিন্তু করে না। মাষ্টাররা একটা ক্রীতদাসের উপর শোষণ করে তার উপর ঘাড়ে চেপে 'গরুর মতো হাকুড়ে খেয়ে' নিয়ে পালিয়ে যায়।'

শিক্ষক বলেছিল—'এই শহরে?'

হরিশঙ্কর বলেছিল—'হ্যাঁ এই শহরে। বলতে পারি তোমরা। তোমাদের স্কুলের ক্লার্ক।'

লজ্জায় রেগে গিয়েছিল সে। প্রত্যক্ষ অপমানের উত্তেজনায় ঘামতে শুরু করেছিল মাষ্টার! সে আর বেশীক্ষণ থাকে নি। থাকতে পারেনি। চলে গিয়েছিল।

হরিশঙ্কর এরকমই স্পষ্টবাদী। ক্যাটক্যাটে কথার জন্য লোকে রাগও করে হরিশঙ্করের উপর। তাতে হরিশঙ্কর কিছু মনে করে না। ছেলেটিকে দেখেই সে ভাবে শিশু শ্রমিকের বিরুদ্ধে এত বড় আইন অথচ ভেক্ ধরে এই বালক ভিক্ষে করছে। তার মনে হলো ছেলেটির স্কুলে ভর্তি হওয়া উচিত যদি সত্যিই তার বাপ মরে তবে অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে দেবে। হরিশঙ্করের এই ভাবনাটাই তাকে ভীষণ তৃপ্তি দেয়। তার নিজের কাজ ভুলে এই সংগ্রহটাই তাকে উৎসাহিত করে।

বাড়ীতে ভিক্ষে দিলে ছেলেটি ভিটের থেকে নেমে গেল। কিছুটা গিয়েই সে থু করে মুখের কুটিটা ফেলে দিল। আড়াল থেকে হরিশঙ্কর দেখলো ছেলেটি হাতের সরা মাটিতে রেখে ন্যাংট হোল তারপর সে বাঁশ বনের দিকে ঢুকে গেল। সম্ভবত পেটের যন্ত্রণায় তাকে বাঁশ বনে যেতে হয়েছিল।

হরিশঙ্কর তার সরার কাছে আসতেই ছেলেটি একটু বিব্রত হোল। জিগ্যেস করলো 'কিরে হাগতে গেছলি।'

প্রথমে ছেলেটি কিছু বললো না।

আবার বললো 'কিরে তোর শরীর খারাপ? গলার সহানুভূতির স্বর ফুটতেই ছেলেটি বললো, 'ভুখ্ লাগছে'।

হরিশঙ্কর বলল 'ঘরে বললি না কেন?'

ছেলেটি চুপ করে রইল।

হরিশঙ্কর বুঝলো ছেলেটিকে হয়তো সে ভাবেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বা শেখানো হয়েছে। বললে 'খাবি?'

ছেলেটি ঘাড় নেড়ে বলল 'হুঁ'।

হরিশঙ্কর ওখানে দাঁড়িয়ে একটা মেয়েকে দিয়ে বাড়ী থেকে এক ডিস্ মুড়ি আনালো। ছেলেটি খেতে থাকলো।

'তোর নাম কি?'—হরিশঙ্কর বলে।

চুপ করে থাকে ছেলেটি।

সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলায়। বলে 'বল না যাব, বল; তোর নাম কি?'

'রাজীব।'

'রাজীব কি?'—ফের জিগ্যেস করে।

'ম্যায় জানা নেহী' ছেলেটি বলে।

'কেন' হরিশঙ্কর জিগ্যেস করে। বুঝতে পারে সে যে ছেলেটি চালাকি করছে। ছেলেটি চুপ করে থাকে। হরিশঙ্কর আবার জিগ্যেস করে 'তোর কটা বাবা'?

ছেলেটি বলে 'একটা, কেন?'

'এই বাপটা তোর কোন বাবা?' হরিশঙ্কর জিগ্যেস করে।

'একটাই তো বাবা।' ছেলেটি হেসে ফেলে।

'তাহলে সে মাসে তোর কোন বাবাটা মরেছিল?' হরিশঙ্কর আন্দাজ করে বলে।

ছেলেটি চুপ করে যায়। মুখের মুড়ি মুখে রয়ে যায়। চোখ নীচু করে। মনে মনে ভাবে, তাকে ধরে ফেলেছে বুঝি। সে কি তবে পালিয়ে যাবে ছুটে। পালিয়ে গেলে সরা নিয়ে ছুটতে পারবে না। যদি পুলিশকে বলে দেয়। অনেক রকম চিন্তা করে।

—'কিরে কি ভাবছিস্? তোর বাবা কেন মরল?' আবার জিগ্যেস করে।

—'না মরেনি?' ঘাড় নীচু করে ছেলেটি উত্তর দেয়।

—'তোর মা আছেন?'

—'হুঁ!'

—তবে বোকার মতো কাচা কাপড় পরে ভিক্ষে করছিস কেন?

--'ভিখ মিলেগা নেহী।'

—'তুই বাংলা জানিস তো।'

—'হুঁ। একটু একটু।'

—'চল তোর সঙ্গে যাব তোদের ঘর।'

—'ঘর নেহী বাবু।'

বলে, 'চল না কি আছে দেখি।'

না বাবু তুমি মুড়ি লিয়ে লাও আমার ঘর যাবে নি। আমি মুড়ি খাব নেহী। সে তীব্রভাবে বিরোধিতা করে ঘর যাওয়ার।

হরিশঙ্কর নাছোড়বান্দা হয়ে যায়। টক্‌টকে ফর্সা ছেলেটা কেন তাকে ঘর যেতে দেবে না। তবে কি তার ঘরে অবৈধ কোন ব্যাপার আছে, নাকি অন্য কিছু। হরিশঙ্কর ভাবে এভাবেই বুঝি এদের জীবন কাটাতে হয়। প্রয়োজনে এদের বাবা মরে মা মরে নিজেদের পেটের ধান্দায় কোন না কোন ভেক্ ধরে নেয়। ভিক্ষা করতে গেলে ভেক দরকার সে তো তার মায়ের কাছ থেকেই জানে কিন্তু তাই বলে এত মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেবে।

—'তোর তাহলে বাবা আজকে মারা গেছে?'

—না বাবু মরে যায়নি। বাপা তো আমায় কাপড়া পরালে বললে কিছছু বলবি না। কুটো দিয়ে ঠক্ ঠক্ করবি। লোকে ভাববে এর বাপ আউর মা মরেছে। চাল পাবি অনেক। আমার পেট কন কন করছে, দরদ হোচ্ছে আজ আর ভিখ্ মাগব না।

হরিশঙ্কর ভাবে কি দুর্ভাগ্য তাদের দেশের। এক মুঠো খাবারের জন্যে বাবা-মাকে শিখিয়ে দিতে হচ্ছে প্রতারণা কেমন করে করতে হয়। হরিশঙ্করভাবে এরা মহাভারত জানে নাকি? অভিমন্যুকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল তার মা, যুদ্ধের জন্যে। হয়তো তাই একমুঠো চাল সংগ্রহ, সেও তো যুদ্ধ, জীবনের মহাযুদ্ধ।

হরিশঙ্কর জিগ্যেস করে 'পড়তে জানিস'। রাজীব বলে 'না'। 'তোর বাবা-মা পড়তে জানে?' সে বললে 'না'। রাজীব জিগ্যেস করে 'পড়ে কি হয়?'

হরিশঙ্কর বলে 'পড়লে কেউ বাপকে মারে না। মিথ্যে বলে না।'

রাজীব বলে, 'চোরি নেহী কিয়েগা তো খায়েগা কেয়া। সাচ মত বোলনা, ঝুট্ বোলনা চাহিয়ে।' হরিশঙ্করভাবে কী ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে দেশটার। এইটুকু দুধের বালকদের এই সবই শেখানো হচ্ছে।

—'তুই স্কুলে পড়বি।' জিগ্যেস করে হরিশঙ্কর।

রাজীব বলে 'হু'। 'বহুত ভাল লাগে স্কুলে পড়তে। কেমন বই নিয়ে সবাই স্কুলে যায়।'

'বাবু, আমি পড়ব?'

হরিশঙ্কর বলে, 'হ্যাঁ পড়বি, স্কুলে যাবি। চল তোদের তাঁবুতে যাই।'

হঠাৎ রাজী হয় রাজীব। 'চলো তবে।'

বেলা হয়েছিল অনেক। এখানেও অনেক কাটল। প্রায় দুপুর হয়েছে। সাইকেল আনাল ঘর থেকে। ভাঙা ঢরঢরে সাইকেলে চেপে বালক রাজীবের সঙ্গে হরিশঙ্কর চললো হাগরীদের পাড়ায়।

হাগরীদের কোন নিজস্ব পাড়া নেই। দু'চারটে পরিবার এখানে বসবাস করছে মাস কতক ধরে। এটা একটা নদীর পাড়। নদীটি যেন ক্লান্ত। না আছে জল, না আছে তট, না আছে স্নিগ্ধ পরিবেশ। শহরের ময়লা ফেলা হয় ঐ হোথায়। ওরই পাশে 'আগিয়া' বললো রাজীব।

আকাশের নীচে কোনক্রমে পলিথিন টাঙিয়ে ভয়ঙ্কর ময়লা কদর্য কাঁথা ধোকড়া নিয়ে কি ঠাণ্ডা কি হিম কি গ্রীষ্মে এই মানুষগুলি অহোরাত্র কাটায়। তাদের আকাঙ্ক্ষা কতটা, স্বপ্ন কতটা না, দেশপ্রেম কিংবা দেশ-বিরোধিতা কতটা তারা নিজের ও জানে না। এদের খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য—এসব নিয়ে কেউ কোনভাবে কিনা তাও এরা জানে না। এরা যাযাবর। এরা যাযাবরী। এরা নারী। এরা পুরুষ। এদের মিল অমিল সত্য-মিথ্যার আসমান-জমিন ফারাক করা জীবন আর কে বোঝে?

হরিশঙ্কর অনেকদিন পর একটা মানে তৈরী করেছে, ঘর নেই বলেই এরা হাঘর। হাঘরে যাদের বসবাস তারা হার্ঘরি। হাঘরিই পরবর্তীকালে হাগরী। হয়তো বা তাই এমনি করেই হাগরী তারা।

হরিশঙ্কর দেখলো তিন চারজন মিলে কি যেন করছে। পুরানো সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দিতেই রাজীব বললো 'এটা আমাদের তাঁবু ওটা সব ওদের। উঁহা বাবা আউর সব হ্যায়, আমি ওখানে মত যাবে।'

ওরা কি করছিল বুঝতে পারছিল না হরিশঙ্কর। এখন শীতকাল। উত্তরের বাতাস গা হাত সব ফাটিয়ে দিচ্ছিল। সারা শরীরে কারো তেল পড়েনি। সাদা হয়ে খড়ি ফুটে গেছিল ওদের শরীরে।

রাজীব ছুটে গিয়ে মাকে কি সব যেন বললো। তার মাকে দেখতে বেশ সুন্দরী। গা হাতে তেল জোটেনি, মাথার চুলগুলো জটা হয়ে আছে। শরীরে অযত্ন কিংবা যত্ন নেবার সাধ্য বা মেধা কোনটাই নেই। কিন্তু তার লাবণ্যকে অস্বীকার করবে কে। সৌখিন সুন্দরীরা সেজে ঘষে নানা প্রসাধনে অসম্ভব সুন্দরী হবার সাধনায় মগ্ন থাকে। তাদের বিঘোষিত গ্ল্যামার এখন সর্বত্র জাঁকিয়ে বসে কিন্তু সমস্ত সৌন্দর্য সাধনার সর্বশেষ প্রার্থনাগুলি তো দূরের কথা নিতান্ত তুচ্ছ ও সাধারণ বোধগুলিও বোধ হয় এই মেয়েটির মধ্যে নেই। কিন্তু জন্মগত কারণে তার দেহ থেকে এল স্বাভাবিক জ্যোতি হরিশঙ্করকে মুগ্ধ করল।

রাজীব বললো 'মা লোকটা হামকো মুড়ি দিয়া থা। আমি ইস্কুলে যাব।' মা লজ্জা পেল। সে মুখে কিছু বলল না।

যেন কি বলবার জন্যে দ্রুত লোকগুলোর কাছে সে গেল। কি সব বললো, তারপর নিজেই হরিশঙ্কর ধীর পদক্ষেপে ওদের কাছে গেল।

লোকটা একটা আস্ত একটা ঢেমনা সাপ ছাড়াচ্ছিল। সাপটার গালাচিটা চিরে কি সব টেনে ছাড়িয়ে দিল। লোকগুলো কি ল্যাংট। প্রায় ল্যাংটই বটে। বুড়োটা খান চারেক ইঁদুর পোড়া করছিল। একটা কাক—হ্যাঁ কাকই তো। বেশ ঠাহর করে দেখলো হরিশঙ্কর। কাক, একটা পড়েছিল পাশে।

হরিশঙ্কর কি বলবে বুঝতে পারছিল না। সে যেতেই লোকগুলো একটু ইতস্তত করলো। কিছু বলতে পারল না। হরিশঙ্কর বললো 'কাক, ঢেমনা সাপ?'

বুড়ো লোকটা বললো 'আচ্ছা হ্যায়। আজ খাও না বাবু। আচ্ছা মজা আয়েগা ইস্ খানামে।'

এরা কি তবে সাঁওতাল নাকি নাগা? হরিশঙ্কর ভাবে। এতদিন সে জানত কাক কেউ খায়নি। ঢেমনা সাপ কেউ খায়নি। কিন্তু এরা, সত্যি এরা—ভাবতে পারছিল না হরিশঙ্কর।

একবার ঘেন্না হচ্ছিল এদের প্রতি আবার সে ভাবছিল কিই বা করবে এরা। কেনবার ক্ষমতা না থাকলে যা জুটবে তার বেশী কিই বা পাবে। মনটা সহানুভূতিতে ভেঙ্গে পড়ে হরিশঙ্করের কিন্তু ত ; কী-ই বা করবার আছে।

সাপটার গা থেকে চামড়াটা অতি সন্তর্পণে লম্বালম্বি ছাড়িয়ে নেয় লোকটা। নাকে রুমাল চাপা দেয় হরিশঙ্কর। নাকে রুমাল চাপা দিতে দেখে ওরা একটু বিরক্ত হয়। হাসাহাসি করে। ওদের ভাষায় কি একটা শব্দ উচ্চারণ করে হরিশঙ্করের প্রায় সমবয়সি লোকটি। বুড়োটা দাবড়ায় লোকটিকে। হরিশঙ্কর বোঝে তাকে গালি দিল সে।

শীতের ঠাণ্ডায় রৌদ্র গড়িয়ে পড়ছে। উনুনে আগুন দিল রাজীবের মা। বুড়োটা রাজীবের মাকে বললে 'বুলালো পুতলী বাবুজীকো বাতচিত কর।' বলেই মাংস ছাড়ানোর কাজে মনোযোগ দিল।

হরিশঙ্কর মেয়েটির দিকে যখন তাকালো তখন সে আর চোখখানি ফেরাতে পারল না। আধপোড়া বেগুনের মতো ঝুলে পড়া মাইওয়ালা মেয়েরা তাদের বিশ বাইশ বছরেই কেমন দেহমনে ফুরিয়ে যায় কিন্তু এই হাগরী মেয়েটার আবেগ যৌবন যেন থৈ থৈ করছিল।

ঢেমনা সাপ খাওয়া রমণীর বুকের সৌন্দর্যও যেন ঠিকরে আসছিল তার চোখে। রাজীবের মাকে বুড়ো 'পুতলী' বলে ডাকে বলেই হরিশঙ্কর বোঝে মেয়েটির নাম পুতলী। হরিশঙ্করের চোখে কোন পাপ নেই। কোন ভোগ-আকাঙ্ক্ষা তাকে নরকের ইঙ্গিত করছে না। কিন্তু একটা আটহাতি কাপড়ে আঢাকা আধঢাকা গায়ের সৌন্দর্য তাকে নানা ভাবনায় পুলকিত করছিল। এদের প্রতিদিনের খাবার প্রতিদিন জোটে না। লেপ নেই কাঁথা নেই খাট নেই পালঙ্ক নেই বিদ্যুৎ নেই টিভি নেই কিচ্ছু নেই অথচ দেখো কী সুন্দরী মেয়েটি। যেন বাঁকুড়া পুরুলিয়ার শুকনো কাঠখোট্টা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শিমূলের লাল ফুলের গাছগুলি ভয়ঙ্কর রোদেও আনন্দ প্রকাশ করে সাবলীল ভাবে, ঠিক তেমন করেই পুতলীকে দেখে তার বুকখানি আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠল।

বুড়ো বললো 'ক্যায়া দেখ রাহা হ্যায় বাবু।'

হরিশঙ্কর ভুলভাল হিন্দি বলতে পারে। চলন-সই বলতে অভ্যস্ত সে। বলে 'কি আর দেখব। ক্যায়া দেখে গা। কুছ্ নেহী। ম্যায় সমঝানো চাহিয়ে হাগরীকা ক্যা দুঃখ্ ক্যায়া, আনন্দ ক্যায়া। ম্যায় মালুম হোনা চাহিয়ে।'

—আনন্দ কাঁহা মিলে গা ভাই, খানা নেহী, পহনে নেহী, পানী নেহী সুখ কাঁহা মিলেগা?

—'তাহলে কি জন্যে তোমরা বেঁচে আছো? কেন মরে যাওনি?' হরিশঙ্কর সরাসরি জ্যিগসে করে রাজীবের মা পুতলী কে।

—মরতে তো চাই মারনেওয়ালা মারনা নেহী তো ম্যায় কেয়া করেগী। মেরী মরদ হর রাত মে বোলে তু মরনা নেহী পুতলী। তুমকো ম্যায় প্যার কিয়া। তু মরেগী তো কিস্‌কো সাথ রাত মে মিলেঙ্গে। তোকে ভালবাসি। মরবি মত।

পুতলী হঠাৎ যেন মনের কথা বলে ফেলে হরিশঙ্করকে। তাতে তার লজ্জা নেই কোন। কতদিন কতবার ফালতু লোক মদ খেয়ে তাকে 'কিতনা পীড়াপিড়ি করেছে'। বলেছে 'পুতলী বাঈ সিরিফ এক রাত তেরী সাথ মিলনা চাহিয়ে।' বুড়ো বলেছে 'এসব কথা আচ্ছা নেহী বুরা বাত। এ বাত শুনতে ভি, বলতে ভি, ভাবতে ভি বুরা আছে। মেরা বহু পুতলী কো কোই না কোই কুছ বলবেই, আ জানা পুতলী মেরী পাশ আ জানা। ছিঃ ছিঃ বাবু, ইয়ে ক্যায়া বাত।'

হরিশঙ্কর লজ্জা পায়। উঁচু শ্রেণীর মানুষের প্রবৃত্তি এই হাগরী মানুষের আসমানের নীচে এসে হাজির হয়। কামনার বস্তু হয়ে যায় পুতলীও।

কালো কারের তাবিজ খানা দুই স্তনের মাঝখানে এমন সুন্দরভাবে ঝুলছিল যে হরিশঙ্কর না তাকিয়ে পারছিল না। এদিকে না তাকিয়েই পুতলী বললে একদিন সব থা বাবু ঘর থা জমিন থা বড়া মকান থা বাগান থা। উন লোক সব ছিন লিয়া। সে বহুত দিন হামার শ্বশুরান কা টাইমমে সব খো গয়া। তো হাম কেয়া করু? বাত ভাল হোবে, ছেলে হোবে, ছেলে না হোবে, একশিরা ভাল হোবে, জোলে পেছাব হবে না, ধাত বন্ধ হোবে, ছেলে লোকের শরীর দাঁড়ানোর ওষুধ হামি দিই বাবু। ওই তাবু মে খোলা আছে। পোশাক আছে। হামরা সব করি যেখানে যা সুযোগ মিলে হামরা সব করবে। চুরিভি করবে, মরদে কে সাথ বুরা কাম করবে। কুন দোষ নাই।'

হরিশঙ্কর একে ককটেল ভাষা বলে। আধা বাংলা হিন্দী ইংরেজী মাদ্রাজী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ মিশিয়ে তৈরী করে নেয় মনের ভাব প্রকাশে। এখানে ভুল হয় ব্যাকরণের। উচ্চারণের শুদ্ধি থাকে না। তবুও ভাষা মনের ভাব প্রকাশ করে দেয়।

হরিশঙ্কর ভাবে 'বলেছি'? জিগ্যেস করে 'ঝুটা হ্যায় ক্যায়া?'

—'নেহী, সব সাচ বাবু।'

বুড়ো বলে 'সত্যি মিথ্যা না আছে বাবু। সমঝো উয়াদের দিকেই তুমকো নজর আছে।'

—'ওকে দেখলে আনন্দ হয় বলে তাকায় সবাই। তাতে ক্ষতি নেই।' হরিশঙ্কর বলে।

'ক্ষতি লুকসান কিউ হোগা। লুকসান নেহী। বাবু, উনকী দেখলো তো মেরা দুঃখ নেহী মেরা বহুকো কেয়া দেখেগা তু। তেল নেহী মিলেগা .তা জৌলুষ মিলেগা কাঁহা।'

জৌলুষের দরকার নেই। কাক কি সাবান মাখে নাকি সাপ বিউটি পার্লারে যায় তবে তারা সুন্দর কেন? জগতের প্রতিমাগুলি নিজের মতো করে সুন্দর নিজের মতো করে মহিমাময়। তাই তাদের জন্য বিউটি পার্লার দরকার হয়নি। হরিশঙ্কর বাধা দেয়, বলে 'ছোড় দো, এক বাত পুছেগা, জবাব দো।'

—'জরুর দেবে। বোল। কেয়া বলতে হোবে।'

—তোমাদের কোন ঘর দোর পোশাক কিছু নেই। তবে কেন বেঁচে আছ কেন মরে যাওনি?

হো হো করে হেসে ফেলে সবাই। বুড়ো রেগে যায় বলে 'বানচোত এ্যায়সা বাত ক্যায়া? বাঁচবে না তো ক্যায়া সব মরবে?'

—না না গালি দেবে না। রাগারাগির গল্প নেই। মেরা দিলমে এক বাত হর রোজ খটখটাতে হ্যায় আপকো আনন্দ কাঁহা?

বুড়ো বলে 'আনন্দ এ্যায়সা চিজ হ্যায় জিসকো দোকান মে, বাজার মে, হাটমে, জঙ্গল মে, মকান মে, আকাশ মে, ভিখমে নেহী মিলে গা, ভাও মে নেহী মিলেগা। বাবুজী, আনন্দ মিলে গা দিল মে। জিসকো দিল সাচ্চা হ্যায় সহী হ্যায় বুরা মত নেহী আনন্দ ওহী মিলেগা। গরীবোঁ নেহী, মালিকো নেহী আনন্দ কা পতা দিল হ্যায়। সমঝো।' খানিক থেমে বলে, 'খাওপিও মস্তী করো, আওরত কে সাথ, বেটা কা সাথ, মা বাপ কা সাথ, ভাই কা সাথ, পড়োশী কা সাথ মজা করো, মস্তী করো আনন্দ মিলেগা। তো এহী নেহী করোগী তো রুপয়া মাঙতে হ্যায়, জমিন ছিন্ লেতা হ্যায়, চোরী করতে হ্যায় তো আনন্দ কাহা মিলেগা। বাবুজী আনন্দ করো। আনন্দ করো। সাপ খাও, ব্যাঙ খাও, ছুঁচো ইন্দুর, কাকভি খাও, খানা কে লিয়ে কোই বাত নেহী, বাত অনুভব কে লিয়ে। ভাবো বাবু সাব। ভাবো।'

অনেকক্ষণ রাজীবকে দেখা যাচ্ছে না। রাজীব কোথা গেল যেন। রাজীবের মা এই বুড়োর বৌমা। বুড়োর বেটা আছে। রাজীব হরিশঙ্করের সঙ্গে তাড়াতাড়ি চলে এসেছে বলে রাজীবের বাপ রেগে গিয়ে ঠাস করে কখন চড় কষিয়ে দিয়েছে। তারপর রাজীব একটা টিনের কৌটা নিয়ে ফের বেরিয়ে গেছে।

হরিশঙ্কর বললো 'রাজীব কাঁহা গয়া।'

পুতলী বাঈ বললো 'কোথা গেল হামি কি জানি।'

জোয়ারের জল এলে জল থৈ থৈ করে, এখন নদীতে জল নেই। খুব সহজেই নদীর এপার ওপার যাওয়া যায়। রাজীব কখন সবার চোখের বাইরে নদী পেরিয়ে চলে ওপারে।

ওপারের ঘরগুলি পার হলে বিস্তীর্ণ আলুক্ষেত। আলুক্ষেতের মাঝে মাঝে পালং শাক সবুজ হয়ে উঠেছে। মূলো ফুলে সাদা হয়েছে মাঝে মধ্যে। মৌমাছি উড়ছিল মূলো ফুলে।

কাকে যেন দেখা গেল আলু জমিতে আলু খুলতে। চাষীরা খুব ভাল করে দেখলো একটা দশ-বারো বছরের ছেলে আলু খুলছে।

একজন দু'জনকে ডেকে আলুখোলার দৃশ্যটা এমনভাবে ওপাড় থেকে দেখতে থাকলো যে ছেলেটি কিছুই বুঝতে পারল না। যারা দেখছিল তারা দেখলো ছেলেটাকে এপাশেই আসতে হবে তাই চিৎকার না করে অপেক্ষাই শ্রেয়।

হাগরীদের ছেলেকে চিনে ফেললো সবাই। 'তোর নাম কি?'

—রাজীব।

—আলু খুলেছিস্ কেন?

—বাপা বোল দিয়া।

—তোর বাবা কোথা?

—তাঁবু মে।

ঘা কতক চাগিয়ে দেবার ইচ্ছে হলেও ছেলেটিকে কেউ মারলো না। কিন্তু হাগরীদের লোকগুলো আলু তুলছে এই প্রচার মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যেতেই কোথা থেকে দশ-পনের জন লোক রাজীবকে নিয়ে নদী পেরিয়ে এলো।

হরিশঙ্কর তখন পুতলীর সঙ্গে কথা বলছিল।

পুতলী বলছিল কাম কাজ লিয়ে। তিন সাল পহলে একটা অফিসারের ঘরমে থা। উন লোক হামকো ভালবাসতো। বলতো তেরী শরীর আচ্ছি হ্যায় পুতলী। সব ভাল বাবু, খানা পিনা রুপয়া কামাই কাপড়া লক্কর সবভি মিলতো। সবভি আচ্ছা থা। হোটাত একদিন হামাকে নিয়ে বাথরুমে মজা কিয়া অফিসারবাবু। তার ঔরত বহুৎ সুন্দর থী। কিন্তু আমাকে কেন প্যার করল হাম জানে না। উস টাইম ম্যায় উসকো কোই বাধা দিইনি। ইসকে বাদ হরদিন হররোজ দোপহর মে, সুবেমে যকন তকন হামার শরীর লিয়ে মজা করতো। হামকোভি মজা লাগতো। হামার মরদ হামকো ইতনা মজা নেহী কিয়া। আমি ওকে কিছু বলিনি। ভাল লাগতো। মগর একদিন উনকা বহু হামকো দেখ লিয়া। শরীরমে কোঈ কাপড়া নেহী থি। তকন মেরী ভি নেহী অফিসার ভী নেই। বহুড়ী হামকো মারলো। লাথি মারলো কাপড়া টুট দিয়া থা। গদ্দার আদমী হামাকে বাঁচালো না। হামকে দোষ দিল শালে। ও বোলা হাগরী মাগীকে দূর কর দো শালীকো। শালী রেণ্ডী কো।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো পুতলী। তারপর বললো 'এহী তাজ্জব জী। এ্যায়সা হি জীবন।'

এসব শুনে হরিশঙ্কর গুম্ খেয়ে গেল। কিছু বলতে পারল না।

উনুনের আঁচে আগুন হওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। শুকনো কতকগুলো লকড়ী লিয়ে সেই হাওয়ার মাঝখানে একটা কাপড় ছেঁড়া ঘেরা দিয়ে আঁচ জ্বলতেছিল। ভাত হলে পর মাংস রান্না করবে। মাংস তো একপ্রকার নয় তাই নানাভাবেই ও মাংস রান্না হবে।

প্রসঙ্গ বদলে খানিক পরে হরিশঙ্কর বললো 'রাজীবকে ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। আমি ভর্তি করে দেব'।

—'তুমি করবে কেন বাবু। না হবে না।' পুতলী বলল।

'কেন ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হবে না। সারা জীবন কাক মেরে খাবে। চুরি করে খাবে।' হরিশঙ্কর বলে।

'উসব ছাড় বাবু। যা হবার লয়. তা হয় নি; হতে পারে নি। রাজীব ইস্কুলে মত যাবে। এই তো জ্বর গায়ে তার বাপ মারলো। মুখ বুঝে চলে গেলো সে। লেখাপড়া করে কি হোবে। কেয়া হোগা বাবু। পয়সা কামাতে পারবে না জমিনঘর বানাতে পারবে? খানাভি মিলবে না। ও কাম হামাদের নেই বাবু। ও সব বড়া চোরদের কাম কাজ। হামাদের এহি ভালো। লিখাপড়া শিখে কোঈ জরুরত নেহী।'

হরিশঙ্কর পুতলীর কথা শুনে তাজ্জব হয়ে যায়। 'লেখাপড়া শেখা বড় চোরদের কাম কাজ'। কথাটা হরিশঙ্করের কাছে সত্য হয়ে উঠে। শিক্ষিত লোকেরা সাধারণ মানুষকে বেশী করে ঠকায়। ঠকাচ্ছে তো বটেই। বেশী আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। ক'জন স্বার্থত্যাগ করে। ক'জন সমাজের জন্য ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে। এতো পারে না সবাই। পারে না, নাকি পারাটা সম্ভবের বাইরে রেখে দিচ্ছে। 'কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে তোমাদের যে মুক্তি নেই এর থেকে।' হরিশঙ্কর বলল।

—'তুমাদের মুক্তির মুখে আগ লাগা দো। মুক্তি কোন দেগা কৈসে দেগা। সব শালা তো মুক্তি হামনে চাইয়ে। কোঈ দেগা নেহী। বাবু মত বোলা সব বড়িয়া বাত। ঝুটা মত বোলো।'

—'তুমি রাগ কোরো না তোমাকে বোঝাতে পারবো না কিন্তু তোমার ছেলেকে তোমাদের মতো দেখতে চাও? একটু ভাল থাকতে দিতে চাও না?' হরিশঙ্কর ব্যগ্র হয়ে জিগ্যেস করে।

—'চাই বাবু চাই। জরুর চাই। মগর ভিখ মাগবে কে। ফাই-ফরমাস কোন খাটেগা। সাপের পিঁড়ি লেকর দু'দশ ঘর যানে তো পৈশা মিলে গা। জানো বাবু ভিখসে পৈসা মিলেগা আউর, আউরত কা শরীর মে পৈসা ফুকুটসে মিলেগা। ফুকুটসে নেহী চাই বাবু, কোই বিশওয়াস নেহী কিয়া তো ভিখ দো, ভিখ সে দিন গুজারতে হ্যায়। তো ক্যায়া করু।' বলেই লকড়ীগুলো বেশী করে ঠেলে দিলো উনুনে।

হরিশঙ্কর যেন মরিয়া হয়ে গেল। সে ভাবল একটা ছেলেকেও যদি পরিবর্তন করে তবে জগতের একটা মানুষ পরিবর্তন হোল। ঠিক একটা চাঁদ ওঠার মতো। প্রসন্ন আকাশের সাধনা যেন হরিশঙ্করের। সে বলল, 'তুমি রাগ করো না তুমি মনে করো তোমার ছেলে নেই, মরে গেছে। ছেলেটা স্কুলে দাও।'

—এ ক্যায়া বাত বাবু। হামে তো এখানে ক'দিন থাকবে।

—এখন আছো তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে যতদিন আছো ততদিন রাখো। কিছুনা কিছু তো শিখবেই।

—তা বটে। কুছু না কুছু শিখবে বটে। ঠিক আছে আমি জরুর পাঠাব। তুমি আসবে বাবু।

বারো চোদ্দজন চীৎকার করতে করতে রাজীবকে তাড়িয়ে আনতে থাকলো। দূর থেকে শোনা যাচ্ছিল 'শুয়ার বাচ্চাদের পুড়িয়ে মারো।' কেউ আবার মুখ খিস্তী করে বেফাঁস কথায় কুৎসিত গালাগালি করছিল। রাজীবকে দেখে পুতলী হাউমাউ করে উঠলো, 'কেয়া হুয়া বাবু মেরা রাজীবকে মারা হুয়া কিঁউ?' কেঁদে উঠলো পুতলী।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজিত লোকেরা তাদের পলিথিনের তাঁবুগুলো ভেঙ্গে দিল। হনুমানের পেচ্ছাবে যেমন যজ্ঞ ভেসে গিয়েছিলো তেমনি এদের রাগে ক্রোধে নিমেষে ধ্বংস হয়ে গেলো ন'মাসের ঘরকন্না। মাটির ঢিল দিয়ে তৈরী জ্বলন্ত উনুনের ভাত সহ ডিসের হাঁড়িটি উলটে দিল। ফেনসহ ফুটন্ত সাদা ভাতগুলি ছাইয়ে পাশে ঘাসে মাটিতে একাকার হয়ে গেল। 'কুত্তা বাচ্চারা চোর, বেরো শালারা দেশ থেকে বেরো শালারা ইত্যাদি অমুক তুমুকসহ বিশ্রী খিস্তী দিয়ে কাঁথা ধোকড়ায় জল ঢেলে দিল।

বুড়ো, পুতলী এবং সঙ্গে আরো তিন জনের পরিবারের সবাই এসে কাকুতি-মিনতি করতে থাকল।

উত্তেজিত জনতার নেতা ফরমান জারি করে বলল, 'আজ এখুনির মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে। না হলে পুড়িয়ে মেরে দেবো শালাদের।'

এখন পাঁচটায় সূর্য ডুববে। সূর্য কি লজ্জা পেলো কিনা কে জানে। বুড়ো সেই নেতার পায়ে ধরে বললো, 'ক্ষমা কর দো বাবুজী। আভি তক খানা নেহী হুয়া। এ্যায়সা মত করো। আজ রাতমে ইঁহা রহনে দো কাল সুবে সে আগে শহর ছোড় দুংগা। ইতনা বড়া

ক্ষেতি মে চার-ছটা আলু কিতনা লুকসান হুয়া হ্যায় আপকো? বাবুজী হামতো সব গরীব আদমি আপকা ঘরমে হামতো ভিখ মাংতা হ্যায়। তো ফির হামারা খানাবি লুকসান কিয়া! এহি রাত মে বহুত ঠাণ্ডা আপ লোক সব পানি ঢাল দিয়া কাঁথা ধোকড়া মে। এ্যায়সা ক্যায়া কিয়া বাবু! এ্যায়সা ক্যায়া কিয়া!'

বুড়োর কান্নায় উত্তেজিত লোকজনের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। কিন্তু দণ্ড হারাল না। হরিশঙ্কর কিছু বলতে পারল না কাউকে। বলবার হিম্মত তার নিশ্চয়ই রইল না।

সেই দুপুরের আগে একমুঠো খেয়েছিল বালক রাজীব। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত অসুস্থ রাজীব কী করবে বুঝতে পারল না। গোটা কতক আলু ছ'টি বা আটটি হবে বা। রাজীব সেগুলি টিনের কৌটায় নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সূর্য আর নেই। অন্ধকার নেমে গেছে। উত্তেজিত জনতার লেশমাত্র নেই। হরিশঙ্করও নেই। সেও এদের সঙ্গে কখন চলে গেছে। দশবারো জনের এই হাগরী পরিবার সারাদিন অভুক্ত থেকে গেল। এদের অভুক্ত দৈনতার বা দুঃখের কথায় কারো কিছু গেলো এলো না। শহরের চতুর্দিকে যথারীতি আলো জ্বলে উঠলো। বাতাসে হিম একটুও কমলো না। যে ছেঁড়া কাপড়টায় উনুন ঘেরা দিয়েছিল সেটাই রাজীবের গায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'পহনে লো'। শীতে জ্বরে কম্পমান রাজীব সেই কাপড়টা কোনক্রমে জড়িয়ে নিল। সেই ভেজা পোড়া ভাঙা জিনিষপত্র যে যার কাঁধে মাথায় বগলে ঝুলিয়ে নিলো। বুড়ো বলল, 'চল, উঠালো তাঁবু।'

পুতলী কেন যেন কেঁদে ফেললো। এর আগে কোথাও কোনদিন কখনো কাঁদে নি। হয়তো বা উনুনের চালের হাঁড়িতে চাল সেদ্ধ হওয়ার সময় তার মনটাও সেদ্ধ হয়েছিল তার রাজীব স্কুলে যাবে। তাদের ঘর হবে একদিন। কিন্তু দিবাস্বপ্ন এত ক্ষণস্থায়ী তা সে ভাবতে গিয়েই কেঁদে ফেলল।

হরিশঙ্করের কথাগুলো তার কানে ব্যঙ্গ হয়ে বাজছিল। 'তোমাদের ছেলেকে তোমাদের মতো দেখতে চাও? একটু ভাল থাকতে দিতে চাও না?' যেন কত অভিমান কত রাগ কত কান্নায় বুকখানা খান খান হয়ে যাচ্ছিল তার। সে যেন চীৎকার করে বলতে চাইলো, 'ভাল হতে চাই বাবু, কিন্তু ভাল থাকতে দেয় না।' সেই অন্ধকারে সেই হিমে সেই ক্ষুধার্ত হাগরী পরিবার কতদূরে চলে গেল কে জানে। পরের দিন হরিশঙ্কর শহরের এপার ওপার অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের কোন ঠিকানা হদিশ করতে পারলো না।

ডাক

—দাদা মাংসের দাম কি হচ্ছে?

অন্যান্যদের ওজনপত্র করতে করতেই গবরা মাংসের দাম বললে।

লোকটি প্রশ্ন করলে 'কম হবে না'?

গবরা বললে 'পারব না দাদা'।

অগত্যা লোকটি এক কেজী মাংস চেয়ে একটা হাতঝোলা ব্যাগ ছুঁড়ে দিল। গবরা হাতের কাজটা সেরে নিয়ে মনোযোগের সঙ্গেই চোড়ের মাংসটা এক কোপে নামিয়ে কাঠের গুড়িটার উপর রেখে টুকরো টুকরো করে নিল তারপর একটি পলিথিনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে। গবরা তার কাজের ব্যাপারে দারুণ হিসেবি। কেননা কোন খদ্দের যাতে তার কাছ থেকে ভেগে না যায় সে ব্যাপারে তৎপর। তাই সে মাংসের মধ্যে যেমন চর্বি দিয়েছে তেমন করে আবার মেটে ফুসফুসি যা যা দেবার তাই-ই দিয়েছে। লোকটা বললো ঠিক দিয়েছেন তো?

গবরা বললো একটু দেখে নিন না। বলেই গবরা লোকটার দিকে তাকালো। এরকম হয়ই, প্রায় সময় ভীড় থাকলে লোকের মুখের দিকে তাকাবার অবসর হয়না কিংবা সবসময় খেয়ালও করা যায় না।

কালো রঙের প্যান্ট পরা গায়ে একটা টি শার্ট। রোগাটে লম্বা। গোছা গোছা চুল। দাড়িটা কামানো। লোকটাকে দেখেই গবরার মনে হোল 'এইটাই সেই লোক'।

গত দু'মাসে অন্তত বার দুই গবরার কাছে ঘুরেছে। কিন্তু গবরা তাকে পাত্তা দেয়নি। পাত্তা দেয়নি তার প্রস্তাবের জন্যে। গবরার বয়েস প্রায় পঁয়তাল্লিশ ছুঁই ছুঁই। বি. এ. পাশ করেছে কবে তার মনে নেই। সে যখন পাশ করেছিল সেই তখন থেকেই সরকারের পরিবর্তন হয়েছে, অনেক দিন। কিন্তু কোন ভাবেই কোনরকমে একটা কাজ জোগাড় করতে পারেনি। কম করেনি গবরা। অনেক বড় বড় নেতার পদ দখল করেছে কিন্তু বেড়ালের শিকে তার ভাগ্যে ছেঁড়েনি। শেষ ইন্টারভিউ দেবার পর প্রায় হতাশ হয়েই সবকিছু ছেড়ে ঘরে বসেছিল। সে সময় নেতারা অনেক প্রস্তাব দিয়ে ছিল 'হ্যান করো ত্যান করো, সমাজ পরিবর্তন করতে হবে' 'হতাশ হলে চলবে কমরেড' ? 'হতাশ হতে নেই।' 'চলো মিটিং করো।' 'মিছিলে চলো ভালো লাগবে'।

গবরা বলেছিল, 'শালা ভাল তো লাগবে আমার বালবাচ্চারা যে মরে গেল, আপনি তো মোটামুটি ম্যানেজ করে লিইচেন।'

কর্মীর মুখের ভাষা শুনে খেপচুরাশ নেতা আর দ্বিতীয় দিন তাঁকে বিরক্ত করেনি। 'যাঃ করনা গে বড় হ' গে যা। তবুও এখানে নেতা করে রেখেছি লোকে আসছে মানছে।

'পার্টি না দায়িত্ব দিলে তুই কেলানী ছাড়া আর কি? দরকার নেই। অনেক মিলেগা। সরকারে আছি আর রিলিফ বিলির নেতা-কর্মী মিলবে নি?' এরকম মনোভাব দেখিয়ে দিল সেদিন গবরার নেতা।

এরপর সব ছেড়েছুড়েই বসেছিল। হঠাৎ এক বিরোধী দলের বন্ধু তাকে প্রস্তাব দিয়ে সহযোগিতা করে অটোস্ট্যাণ্ডের পাশে একটি চাঁচ ঘিরে মাংসের দোকান করতে লাগিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে গবরা আর ওসব সমাজ পরিবর্তনের কম্ম করতে পারেনি। ওসব গুষ্টির পিণ্ডী যারা করে বেড়াচ্ছে তারা প্রায় সব বড় সুখরাম নয় ছোট সুখরাম।

লোকটি টাকা দিতেই গবরা তা গুনে নিয়ে এনামেলের ছোট বাক্সটায় রেখেদিলো। তারপর পলিথিনের প্যাকেটে মাংসটা পুরে তার নাইলনের ব্যাগে ঢুকিয়ে লোকটির হাতে দিল।

লোকটি ব্যাগটি হাতে নিয়েই মন্তব্য করল 'ঠিক দিইচেন তো?'

—আপনার সামনেই তো দিলুম!

—'না পাঁঠী কেটে রাখেন নি তো?' লোকটি বলল।

এ কথায় গবরা কোন কিছু মনে করলো না। কেননা এ কথার কোন মানে নেই। কেননা হেথায় সে অসভ্যতা করবে না। বুড়ো লোকের যুবতী বউ যেমন যত্নের তেমনি বুড়ো বয়েসের দোকান, তার তো যত্ন থাকবেই। সে ঠাট্টা মনে করেই কথার কোন উত্তর না দিয়ে অন্য খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে থাকলো।

লোকটি ব্যাগ থেকে মাংসটার প্যাকেটে মাংসটা ঘাঁটতে থাকলো। ঘাঁটতে ঘাঁটাতে বিরক্ত হয়ে বললো। 'হ্যাঁ মশাই এটা কিসের দোকান?'

—কেন?

'না মানে মাংসের দোকান যদি তবে এতো হাড় দিয়েছেন কেন?' রেগে গিয়েই লোকটি বললো।

'তার মানে?' ব্যগ্রভাবে গবরা বললো।

'মানেটা অতি সোজা মাংসের দাম দিলুম। অতগুলো টাকা দিলুম। আমাকে হাড় দিলেন কেন?'

লোকটার উপর এমনিতেই চটা ছিল গবরা এবার আরো চটে গেল!

কিন্তু লোকটাও দমবার পাত্র নয়। গবরা বললে 'ঐ তো আমার ট্রেড লাইসেন্স। যান দেখুন না গে।'

লোকটা একটু ঘাড় নাড়ালো, যার একটা অন্য মানে আছে। তবুও লোকটা দেওয়ালের দিকে গিয়ে দেখলো যে মাংসের দোকানের ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে।

লোকটা রেগে গিয়ে বললো 'অত টাকা দিলুম মানে কি আমার টাকাটা ফালতু?' গবরা বুঝতে পারলো না। বললো, 'আপনি কি বলতে চাইছেন?'

লোকটা স্পষ্ট করেই বললো, 'এক কিলো মাংসের দাম অত টাকা নিচ্ছেন অথচ হাড় দিচ্ছেন কেন? হাড় আর মাংস কি একই দাম। এতো পুরোপুরি ভেজাল। এতো অদ্ভুত ব্যবস্থা দেখছি।'

আরো যে দু'দশজন খদ্দের দাঁড়িয়েছিলেন তারা এইসব দেখে ঘাবড়ে গেলেন কিন্তু মজা দেখা যেন পেয়ে বসলো। চিরকালই এই বাদী বিবাদীর যুদ্ধ হয়েছে অথচ তৃতীয় পক্ষ বর্তমান থাকলেও তারা নিরপেক্ষ থেকে ঝগড়া বাড়িয়ে দিয়েছে। তারা যদি একটু সক্রিয় হয় তাহলে ঝগড়া বাড়ে না কিন্তু তৃতীয় পক্ষ প্রায় মূক থাকবেই।

তাদের মতই একজন ফুট কাটলো 'মশাই জম্মে মাংস কেনেন না বুঝি।'

অন্যজন বললে 'গোবুরে পোকার অবশ্য হাড় নেই' একজন বুড়ো মানুষ খদ্দের ছিলেন তিনি বললেন 'ওকে নিহেড়ের মাংস দিতে পারতেন কিন্তু অতটা পাবেন কোথায়?' নিহেড়ে মাংস কথাটা যে একটু অশ্লীল ইঙ্গিত আছে সেটা বুঝতে পেরে লোকটা বললো 'যা তা বলছেন কেন?' আপনাদের ইচ্ছে আপনারা মাংসের দাম দিয়ে হাড় নিবেন। মিষ্টির দাম দিয়ে রস কিনবেন কিন্তু আমি নেবো কেন? এক আধ দিন চলতে পারে কিন্তু চিরদিন চলবেই বা কেন? আর তাই যদি চলবে তবে মাংসের সঙ্গে নাড়িভুঁড়িগুলোও তো সমানুপাতিক দিতেন কই, কেউই তা দেননি তো। সেগুলোতো অন্যভাবে বিকিয়ে দেয়, হাড়ের বেলায় এইসব কথা আসছে কেন?

লোকটা যে থানার কনস্টেবল এটা ধারণা আছে। পূর্ব পরিচয়েই জানা হয়ে গেছে তার কিন্তু আজকের এই তর্কের যে একটা অন্য মানে আছে তা দেখেশুনে কেমন মজা হচ্ছিল। কেমন একটা ঝামেলায় জড়িয়ে যাবে হয়তো বা এটা স্পষ্টতর হচ্ছিল। গবরা বললো, 'রাখুন তো মশায় আপনাকে মাংস নিতে হবেনি। টাকা ফেরৎ নিন।'

'টাকা ফেরৎ নিতে তো আসিনি। মাংস নিতে এসেছি সুতরাং মাংস দিলেই সমস্যা মিটে যায়।' খদ্দেরদের একজন বললে 'ধূর ধূর এসব আজে বাজে ঝামেলা করছেন কেন? এসব না করে যান দেখি। আমাদের মাল দিন।'

লোকটা আবার বললে, 'হাড় বাদ দিয়ে মাংস দিবেন কিনা?'

গবরা রেগে মুখে খিস্তী দিয়ে বললো, 'যান যান মাংসও হবে না টাকা ফেরতও হবে না। যা ইচ্ছে তাই করুন।'

লোকটা বিশেষ আর কিছু বলল না। মাংসের ব্যাগ নিয়ে দোকানকে পিছন করে সোজা চলে গেল। খদ্দেররা হাসাহাসি করছিল। দু'একজন টিপ্পনী কাটলো কিন্তু কেউ তেমনভাবে গুরুত্ব দিল না। গবরা মাংস বিক্রী করায় ব্যস্ত থাকল।

প্রায় ঘণ্টা দুই অতিবাহিত হয়েছে। এখনো কিলো পাঁচেক মাংস বিক্রী হতে বাকী আছে। আজ দু'টো মাল নামিয়ে ছিল। বিশেষ কোন লোক নেই। মাংসটা কাটার একজন কসাই আছে। সে মালটা কেটে রেডী করে দেয়। সব দিয়ে থুয়ে যা থাকে তাতে মোটামুটি ভালই। চালিয়ে নেয়। কিন্তু যেদিন মালটা রয়ে যায় সেদিন তার ক্ষতি হয়ে যায় প্রচুর। কম দামে ধার দিতে বাধ্য হয় হোটেলগুলোতে। কিংবা মাল কেনার সময় যেহেতু কোত করে কিনতে হয় সেখানে গণ্ডগোল হলে একটু ক্ষতি হয়ে যায়। সে ক্ষতি মেনে নিতে রাজী আছে গবরা। সে ক্ষতি হতেই পারে। কিন্তু এ ব্যবসার মজা হলো সব বিক্রী হয়ে যায়। চামড়া তো একস্ট্রা বটেই। এসব নিয়ে গবরা বেশ ভালোই আছে। একেবারে চলছিল না সংসার। এখনতো মোটামুটি চলে যাচ্ছে। পরপর তিনটে মেয়ে হবার পর গবরার ছেলে হয়েছে। তার বয়স এখন বছর পাঁচ হবে।

'ছেলে একটা চাই' এই চাইতে গিয়েই দেরী করে ফেলেছে। সংসারটাও বেড়েছে। মা-বাবা আছেন। তারা তার কাছেই থাকেন। এমন কিছু মেয়েদের দেখা যায় যারা বৃদ্ধ বাবা-মা ভাই ভগ্নীর উপর নৈতিক দায়কে স্বীকার করে না। কিন্তু গরবী এই দায় স্বচ্ছন্দে মেনে নেয়। তাকে ভালো লাগে। আবার স্থানহীন দায়িত্ববান লোকেরাই বেশী দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় গিয়েও লোকের জ্ঞান ধৃষ্টতা দেখায়। এসব বাজে প্রবণতা গবরার মধ্যে নেই।

খাকী প্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক একটা কাগজ দিয়ে বললো 'থানা থেকে আসছি নোটিশটা পড়ে নিন সই করে দিন'। একটু হকচকিয়ে গেল গবরা। বললো 'কেন'?

—নোটিশে লেখা আছে পড়ে নিন।

অবিক্রীত মাংসের তালের সামনে উঁচু হয়ে বসে থাকা গবরা নোটিশটি পড়ে নিতে থাকলো। থানা লিখেছে 'নোটিশ পাওয়ার মাত্র চলে আসুন নাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা হবে'। 'নোটিশটাও সই করে ফেরৎ দিতে হবে।'

গবরা বললো, 'কি ব্যাপারে বলুন দেখি, চা খাবেন'?

খাকী প্যাণ্টের পুলিশ 'দিন একটা' এমন মনোভাব দেখালো যা দেবেন তাই খাবেন। বিনি পয়সায় পেলে ও সব খাবে, বিষ মাত্র বাদ যাবে। সে বিষ খাবে না।

মাঝে মাঝে থানা এসব চিঠি পাঠায়। যে চিঠি আইনের উর্দ্ধে। এতে ভালও হতে পারে, খারাপও হতে পারে। কপিহীন চিঠির উদ্দেশ্য প্রায় ভালো হয় না। ক্ষমতাবানের কাছে ক্ষমতার সম্মান পাওয়া কাম্য এবং আমাদের ক্ষমতাবানেরা তো ক্ষমতা দিয়ে স্বার্থের দাসত্ব করে, তাই দাস মনোবৃত্তির ক্ষমতাভোগীরা ঘৃণার উর্ধ্বে উঠতে পারেন না। গবরা বললো, 'সেবেলা যাবো। মালটা বিক্রী করে দিই।'

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চা খেতে খেতে খাকী প্যান্টের লোকটি বললো 'তা হবে না। এখুনি যেতে হবে।' সে তাড়া করতে লাগলো 'চলুন চলুন'।

একটু বাজার হয়েই দোকান থেকে উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'দেখুন এই মাংসটা বিক্রী করে দিয়ে যাই একটু সময় দেন।'

—'না সময়টা দেওয়া যাবে না একদম। আপনি এখনই ফিরবেন'।

এমন কিছু অন্যায় সে করেনি যে তাকে ভয় পেতে হবে। কিন্তু ক্ষমতাবানদের তো সব সময়ই ভয়। যে কোন সময়ই সে তাকে হেনস্থা করে দিতে পারে। এমনিতেই শাস্ত্রে বলে নদী নারী নখধারী সিংহধারীদের বিশ্বাস করতে নেই। তাই লোকটা তো সাধারণ লোক নয়। পুলিশ যদি সাধারণ লোক হোত তবে তো কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু পুলিশের তো নখ-সিং দুইই আছে। কেননা ব্যবস্থাটারতো রিমডেলিং হয়নি। যে পুলিশ বিয়াল্লিশে মানুষ মেরেছে সে পুলিশই সাতচল্লিশে 'বন্দেমাতরম্' বলে জাতীয় পতাকা তুলেছে। যারা সত্তর দশকে খুনের সমুদ্রে স্নান করেছে তারাইতো পরবর্তীকালে পুরস্কার পেয়েছে। আসলে পুলিশ মানুষটা খুব দোষী নয়। তার হাতে নল আর মাথায় শিং নামক ক্ষমতার টুপি, একেই ব্যবহার করছে সবাই। পুলিশ যখন বিরোধীকে মারে তখন পুলিশ খুব খারাপ। কিন্তু সেই বিরোধীরা যখন শাসক হয়ে পুলিশের গার্ড সব অনার নেয় তখন পুলিশ আর শত্রু থাকে না, মিত্র হয়ে যায়। সুতরাং এইসব ভাবনার মধ্যেই গবরার ভয় আসে। আবার ভাবে কাকে ভয়।

গবরা একটা পুরানো প্যান্ট শার্ট পরে নেয়। দোকান বন্ধ করে। বলে 'চলুন'। মাথায় খচ্ খচ্ করতে থাকে। ইস্ মাংসটা রয়ে গেল।

যাবার সময় সে এ দোকান, সে দোকান অনেক দোকান খুঁজল। চোখ চারালো কাউকে প্রায় দেখলো না। বিপদ আসন্ন হলে মানুষের অসহায়ত্বের সময় খুঁটির মতো শক্ত মানুষের দেখা মেলে না যে কিনা তার সহায় হবে। গবরার মধ্যে একটা ভয় দানা বাঁধলো, এমন নয়তো সে রাস্তাধারে ঘর করছি বলে পি.ডবলু কেশ করলো। কিন্তু কেন?

অনেক বছরের রক্ত ঘাম পরিশ্রমের লাবণ্যের স্মৃতি তার পার্টি অফিসে পড়েছিল। একবার ভাবলো যাই একবার দেখা করে আসি। বলি নেতৃত্বকে। অফিসে গিয়ে নেতৃত্বদের দেখেছে সে। কিন্তু কেউই যেন চিনতে পারলো না। তেমন আমল দিতে চাইল না। প্রায় এক বছর হোল পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই বলেই তার তের বছরের সম্পর্ক কেমন যেন অস্বীকার হয়ে গেছে। পার্টিতে নয়া নেতারা তাকে মূল্যায়ন করেনি। পুরানো নেতৃত্বরা চিনতে পারেনি। একটু না চিনি না চিনি পরিণতি। এই অস্বাভাবিক আন্তরিক সম্বর্ধনা পেয়ে গবরা বিতর্ক এড়ায়। সে থানাতেই যায়।

স্বাধীনতার অনেকদিন পরেও থানাটাকে নিজের জায়গা বলে মনে হয়নি মানুষের। সে যত বড় তেজীই হোক থানাতে গেলেই একটু মন্দ মন্দ হাওয়ায় গা গুলায়। এক অনাবশ্যক সত্যের জন্য নিজেকে বিপন্ন হয়ে যাবার সম্পন্নতা খোঁজে। গবরা সোজা থানায় গিয়ে সেন্ট্রিকে জিগ্যেস করলো অমুক বাবু আছেন? সেন্ট্রি কোন কথা বলার প্রয়োজন মনে করলো না। সে ইঙ্গিত করে জানাল ওদিকে যাও। গবরার এ থানা বিশেষভাবে পরিচিত। কতবার কত কাজে এসেছে। হোমগার্ড, সাধারণ দু'একটা কনস্টেবল এর জানা আছে। কিন্তু অফিসারেরা কেউ নেই। সে তো কখনই রাজার পাট করেনি। রাজার সঙ্গে অনেক বার এসেছে। সেভাবেই দেখেছে গবরা। কত ভাল কথা লেখা আছে। সেবা করছে পুলিশ। গবরা এসব মানে না যে তা নয়। সেবা যে করে না একথা বলতে পারবে না। কিন্তু গবরা এটা বিশ্বাস করে যে সেবাটা বিনে পয়সায় করে না। পয়সা ফেকো তামাসা দেখো'র মতো। সেবা পেতে গেলে একটা পয়সা দাও। কিন্তু পয়সা তোমাকে দেবো। তুমি তো কাজের জন্য আছো। তোমাকে তো সরকার তাই বেতন দেয়। রেশন দেয়। পেনশন দেয়। মেডিক্যাল ঘরবাড়ী ধন সব দেয়। তোমাদের আর কি চাই।

গবরার কিছু করার নেই। সেই যে বামুনকে শ্রাদ্ধের সময় গোদানের পরিবর্তে পাঁচসিকে দিলে ক্ষমা হয়ে যায় ঠিক তেমনই ব্যাপারটাও। দরজার মুখের সামনে ঢুকতেই একজন বললো 'কাকে চাই'? গবরা বললো 'এই কাগজ' কাগজটা হাত বাড়িয়ে ধরলো। কাগজটি পেয়ে চোখ বোলাতে বোলাতেই বললেন 'ব্যাপারটা কি ভেবেছো হে, পুলিশকে না দিয়েই করে খাবে। ফুটপাতে ব্যবসা করবে হপ্তা দিতে হবে না।'

গবরার বুক টিপ টিপ করলেও সাহস হারাবার ছেলে নয় সে।

'কিসের হপ্তা? কেন হপ্তা? কার হপ্তা?'

সাবইনসপেকটর ভদ্রলোক বললে 'তোর বাপের হপ্তা? পুলিশ কী বাপঠাকুরদা যে বিনে পয়সায় ছেড়ে দেবে?'

'—তা কেন দিবে?' কিন্তু হপ্তা দেবো কেন? গবরা বললো।

মেজবাবু কথাটা ক্যাচ করলো? শান্তভাবে বললো, 'না হপ্তা দেবে কেন? কিন্তু আপনি কি ব্যবসা করেন ভাই?'

—খাসী মাংসের দোকান। একটু কাঁচুমাচু হয়ে বললো।

ট্রেড লাইসেন্স আছে?

—হ্যাঁ।

হোল্ডিংস আছে?

—হ্যাঁ।

লাইফ ষ্টক অফিসারের ছাড়পত্র আছে?

—না।

ফরেষ্টের অনুমোদন আছে?

—না।

পশুপালন দপ্তর আপনাকে লাইসেন্স দিয়েছে?

—না।

যে ছাগল কাটছেন সেগুলোর মেডিক্যাল ফিটনেস আছে?

—না, কিন্তু এত কিছু পাব কোথা?

'তাহলে আপনি ভাবুন, আপনার ব্যবসাটাই বেআইনী'?

—না।

—কেন নয়?

—এসব তো কারুরই নেই। তবে তাদের চলছে কেন?

কেনর উত্তর তো আমরা দেব না।

সামনের টেবিলটা এস. আই.-এর। সে বললো 'এত সব তো বলা যাবে না। টাকা দেবেন চলে যাবেন। এইতো ব্যস।'

গবরা বললে 'এসব কথা তো আলোচনা হতে পারতো, আমার মাল ফেলে এসেছি স্যার তাহলে এখন যাই।'

'কোথা যাবেন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে?'

'কিসের অভিযোগ? সবিস্ময়ে প্রশ্ন'।

'অভিযোগ একটাই খাদ্যে ভেজাল দিয়েছেন।'

'বুঝতে পারলুমনি।'

এস. আই. গর্জন ঝেড়ে বললে 'মাংসে হাড় ভেজাল দিয়েছেন কেন'?

কোন কথা বলতে যাবার আগেই মেজবাবু ঘাড়ের কাছে এক থাপ্পড় মারল। 'যা শালা। য়ু আর আণ্ডার অ্যারেষ্ট।'

হঠাৎ আক্রমণে গবরার পিলে একদম শুকিয়ে গেল। একজন কনস্টেবলকে বললে যাও শালাকে লক আপে ঢুকাও তো।' তখন পুলিশের লোকজন ছাড়া অন্যজন ছিল না। তাই স্বাধীনভাবে পুলিশ বলতে থাকলো 'দশ টাকা হপ্তা দিতে গাঁড় চড়চড় করে এবার নে শালা খরচা কর তিন হাজার টাকা। কেশ চলুক চার বছর।' পুলিশ তার সঙ্গে মিনিমাম আচরণটুকুও করল না। জামার কলার ধরে লক আপে ঢুকিয়ে দিলো।

বিপন্ন অসহায় আর্ত মানুষ যেমন হঠাৎ বিপদে নিজের সম্বিত হারিয়ে ফেলে সেরকম ভাবেই গবরা নিজের সম্বিত হারালো। কোন কিছুই বলতে পারল না। পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত তার কাঁপতে থাকলো। দরদর করে ঘামতে থাকলো সে।

অনেকক্ষণ পরে তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল বের হতে থাকলো। সে বিনা মেঘে বজ্রপাতের গল্প শুনেছে, দেখেনি। আজ সে বুঝতে পারলো বিনা মেঘে বজ্রপাত কিরকম?

সাব ইন্সপেক্টর একটু পরে বললো 'এই শালা দেখ আখের রস বিক্রী করে সেও হপ্তা দেয়।' পাতলা কালো গোছের একটা লোক হাসতে হাসতে চলে গেল। গবরা তাকালো কিছু বললো না।

গবরা ভাবছিল আমরা কোথায় বসবাস করছি। জেলের মানুষ কোন গর্তের মোহে বেঁচে আছে। সরকার তো মানুষের উপর হৃদয়হীন নয়। নির্দয় নয়। দৈনিক জিনিষের দাম বাড়ে মানুষের আয় বাড়ে না। কাজ বাড়ে না। মানুষ পথে নামে। নামার পথ মসৃণ পিচ্ছিল হয়েই থাকে। নেমে পড়ে সে। তখন সে কী তার আর্তনাদ করেও বাঁচবে। শুনেছিল থানায় ডাক হয়। ডাকবাবু আছে। তারা ডাক তোলে। সেই ডাক নেওয়ার জন্য লোক আছে। টাকা ভাগ হয় সবার মধ্যে। শুনেছে এসব, কিন্তু বিশ্বাস ছিল না তার। ভাবটা এমন ছিল যে চোখে না দেখলে সে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু বাছাধন গবরা এমন একটা অবস্থায় হঠাৎ জড়িয়ে গেল যেন এ জীবনে তার বিশ্বরূপ দর্শন হচ্ছে। হপ্তা তোলা আদায় দেওয়া কোনটাই আইন নয় অথচ হপ্তা দিতে বাধ্য করা হবে। সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসাদার হকার সবাইকে হপ্তা দিতে হবে। কেন কিসের যুক্তিতে? হপ্তা দিলেই কী দোষ শুদ্ধ হয়? আইন শুদ্ধ হয়? মানুষের কল্যাণ হয়? গবরার অনেক প্রশ্ন বেড়ে যায়। এতবড় একটা অন্যায় জগদ্দল পাথরের মতো বসে আছে অথচ এরজন্য কোন আন্দোলন হয় না। যারা আন্দোলনের ব্যবসা করে সেইসব রাজনীতির ব্যাপারীরা কেন এ সম্পর্কে (রা) কাটে না। জমি বর্গা বোনাস বেতন ভাড়া কত কী নিয়েই নাকি মুক্তির আন্দোলন হয় তবে এই হপ্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন নয় কেন?

যেন ঘোরের মধ্যেই ভেবে যাচ্ছে গবরা। পুলিশ হয়তো বলে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যারা করে খাচ্ছে তারাই বা দেবে না কেন? বেআইনী কাজ করছ তাই হপ্তা দিচ্ছ। কিন্তু গবরার প্রশ্ন 'যদি বেআইনীই হবে তাকে তুমি আইনসিদ্ধ করো। হপ্তা দিলেই তো আইনসিদ্ধ হবে না? হয় ব্যবসাকে আইনসিদ্ধ করতে হবে, না হলে বন্ধ করতে হবে; তবেই তো কল্যাণ। জগতের কল্যাণতো সে ভাবেই আসে। সে ভাবে, গবরার মতো লোক যা সহজে বোঝে, দায়িত্ববান লোকেরা তা বোঝে না কেন?

ঘণ্টা দুই কখন লকআপের মধ্যে কেটে গেল গবরার। সে নিজেকে আড়ষ্ঠ আর নিঃসঙ্গ মনে করলো। রাতে কারা ছিল কে জানে ওর বাঁদিকের কোণটায় মূতে গেছে যেন। বিশ্রী গন্ধে বসা যায় না। কাকের মতো কালো কালো মশা পোঁ পোঁ করছিল। মুখ দিয়ে থুতু বেরচ্ছিল যেন। একবার জানলার দিকে দাঁড়ালো। ওদিকে একটা খাল।

দূর খালের উপরে একটা সেতু। সেতুর পাশে অফিস, ব্যাংক, মার্কেট, ভদ্রলোকের আস্থানা। আসামী গবরা যেন জানালায় ভদ্রলোকদের ঢং দেখতে লাগলো। ঠিক একটায় লক আপ থেকে বের করে আনা হোল গবরাকে। সাব ইন্সপেক্টর বললো, 'কিছু ভাবলে?'

গবরা বললো 'কিছুই ভাবতে পারছি না।'

মেজবাবুর পায়ে ধরলো গবরা। 'অত টাকা দিতে পারব না। আমার সঙ্গতি নেই।' বড়বাবুর ঘর থেকে, গাড়ী ব্যবসা করেন রবিবাবু, বড় মাপের নেতা; ব্যস্ত হয়েই বের হলেন। গবরাকে চিনতেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'গবরা দেশাচার মানতে হয়। বিরুদ্ধাচার করতে নেই। কী লাভ। সমাজ পরিবর্তন কী করতে পারব ভাই। তাই যতক্ষণ টেকা যায় ততক্ষণই টিকতে হবে। পুলিশ যা বলে মেনে নাও।'

গবরা বলবার সাহস হারায়। রবিবাবু শাসক দলের লোক। তিনিও থানার এই অন্যায় ব্যবস্থার কথা জানেন তা সত্ত্বেও কেন তিনি কম্প্রোমাইজ করবেন? মনে মনে হাসে গবরা, 'শালারা অসৎ বলেই কী বুড়ো বয়েসে শাস্তি পায় না। কার ছেলে মরে যায়। কাকে মদ বেচে জীবনযাপন করতে হয়। হয়তো বা সেজন্যেই।'

রবিবাবুর কথায় উৎসাহিত হয়েই মেজবাবু বললো, 'না, এ শালার কপালে কষ্ট আছে; শালাকে চালান করে দাও।'

এবার কেঁদে ফেললো গবরা। প্রায় হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললো। 'এতদিন বেকার ছিলুম কেউ মুখের দিকে তাকায়নি আজ তো একটু পরিশ্রম করছি এখনই অত্যাচার নেমে আসছে। পুলিশের ঘরের ছেলেরা সবাই কি পুলিশ মেজবাবু। কেউ কী ব্যবসা করেনি? আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমার ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।'

সকালের সেই লোকটি কখন এসে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়েছিল গবরা দেখেনি। মেজবাবুর উদ্দেশ্যে লোকটা বললে, 'না স্যার আমাকে অনেকবার হেনস্থা করেছে এর টাকা আদায় না হলে অন্যেরা টাকা দেবে না। আমাকে দোষ দেবেন না।' লোকটা যে অন্যায় ভাবে গবরাকে ফাঁসিয়েছে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। শয়তানেরও তো প্রাণ আছে। সে যেন একটু মায়ার বশেই মেজবাবুকে বললে 'স্যার আমি ওর সাথে একটু কথা বলি। পরে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

আবার লকআপে পাঠানো হলো, তাকে ক্ষিধে পেয়েছে ভীষণ। এখনো পর্যন্ত খাবার দেয়নি থানা। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি তার। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গবরা। লোকটি লকআপের রেলিঙের কাছে এসে বললো 'গবরাবাবু নিজের বিপদ নিজেই করছেন কেন? মেনে নিন না' অসুবিধা নেই। আমি আছি সাহায্য করব।'

অনেকটা অবসন্ন মন আর ক্লান্ত দেহ নিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়ালো সে। লকআপের ভেতর থেকে দাঁড়িয়েছিল গবরা আর রেলিঙের বাইরে দাঁড়িয়েছিল সেই লোকটা। মাঝখানে লকআপের রেলিং। মৃদু হেসে হালকা মেজাজে লোকটি বললো, 'ভাবছেন? দেখছেন তো আপনার ছেলেমেয়েরা আছে তাদের জন্যই আপনাকে ব্যবসা করতে হবে। ঝামেলা বাদ দিয়ে সামান্য ছাড়রফা করে মীমাংসা করে নিন।'

গবরা ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানাল। এই অসম্মতির মধ্যেই তার প্রত্যয়কে বুঝে নিতে কষ্ট হল না লোকটার। লোকটা ফের বোঝাতে চাইলো। গবরা অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে লোকটার মুখের উপর এক ধাঁধা থুতু দিল। লোকটা একটা ভয়ঙ্কর চীৎকার করে বললো 'দেখুন স্যার দেখুন' বলেই অশ্রাব্য গালাগালি করতে লাগলো। থানার স্টাফেরা সবাই দেখলো ডাকবাবুর সারা মুখমণ্ডলে থুতুতে ভর্তি হয়ে গেছে। গবরা নিশ্চল পাথরের মতো রেলিঙে হাত দিয়ে অবলীলায় দাঁড়িয়ে রইল। সে ক্রুদ্ধ, অপমানিত তার কোন বিকার নেই।

উড়ান

নীরুর মন কেমন করছিল। কোথায় বাংলাদেশ আর কোথায় আমেদাবাদ। দু'দিন দু'রাত ঝম্‌ঝম্‌ করে নদী পাহাড় মাঠ পেরিয়ে নীরু চলে এসেছে সোনার কাজে। তার মা সেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছে 'নীরু বাপ্‌ আমার তোকে খাওয়ার জন্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি অনেক দূরে। মন দিয়ে কাজ করবি বাবা। তোর মুখ চেয়ে বসে থাকব আমি।' নীরু কেঁদেছে। তার মা-ও কেঁদেছে।

সে জেনেছে যে সে ঘর থেকে দু'হাজার মাইল দূরে চলে এসেছে। রাতে কতটা পথ সে এসেছে সে জানেনি। কিন্তু দিনের বেলা দেখেছে অজস্র পাখী আর অজস্র মানুষ। পাহাড় পেরোতে পেরোতে বানর দেখেছে। বানরের নোনু দেখেছে।

ক'মাস এসেছে নীরু। তার মাকে দেখেনি। ভাইকে দেখেনি। বোনের জন্যে খুব মন খারাপ করে। বোনের সঙ্গে তার দারুণ খুনসুটী। তার চুলের গোছা ধরে সেদিন কি মারটা না মেরেছে নীরু। তখন সে বোনকে গাল দিয়েছে 'তুই মর না মর।' এত দূরে এসে নীরুর বোনের জন্যেও মনটা খারাপ হয়ে যায়। কাজ করতে করতে আনমনা হয়ে যায় 'বোন যদি সত্যিই রাগ করে মরে যায়।' সে মনে মনে বলে 'বোন তুই আমার জন্যে রাগ করিসনি বোন। তোর জন্যে দু'টো সুন্দর জামা কিনে নিয়ে যাব।' নীরুর চোখে জল আসে।

নীরুর বাবা পার্টি করতো। সংসারের কোন কাজ করতো না, সে নাকি বিপ্লব করবে। তার মা আনাজ বেচে সংসার চালায়। কিন্তু ওদের পার্টিতে কি সব গণ্ডগোলের জন্যে নীরুদের ঘর ভেঙে দিয়ে গেল ওদেরই দলের লোকেরা। সেদিন ওর বাবা-মা সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে হু হু করে কেঁদেছিল। নীরুর মা বলেছিল তার বাবাকে 'তোমরা কি এমন ছোটো লোকের পার্টি কর গো যারা তোমার ঘর ভেঙে দিলো। যে পার্টির জন্যে দিনরাত কুত্তা হয়ে পড়েছিলে সেই পার্টিই তোমার ঘর ভাঙবে কেন? থুঃ তোমার পার্টিকে।'

নীরুর বাবা কোন উত্তর দেয়নি। মাত্র বলেছিল 'তোষামোদ করিনি বলে ওরা নোংরামি করে গেল।'

ক্লাস থ্রিতে ফার্স্ট হোত নীরু। নীরু ভাল পড়া করতো। নীরু আবৃত্তি করতো মাইক্রোফোনে।

গোবিন্দ শেঠের দোকানে যে ছ'জন লোক সোনার কাজ করে তার মধ্যে নীরুই সবচেয়ে ছোট। সে এখন ছোক্‌রা। মাত্র ন'বছর বয়েস তার। তাকে এখন গোবিন্দ শেঠ ফাই-ফরমাস খাটায়। রান্না করায়। পায়খানার জল তোলায়। স্নানের জল তোলায়।

চা আনায়। কাপড়-জামা কাচায়। পান থেকে চুন খসলে তার বাপ-মা তুলে গাল দেয়। তাকে 'কুত্তা' বলে। 'শুয়ার বাচ্চা' বলে। আরো কত কি!

কিন্তু সবাই যা খায় নীরুও তাই খায়। নীরুকে সবাই ভালবাসে। ছোট ভায়ের মতো কিন্তু খাটায়। নীরু খাটে। তার কষ্ট হয়। তার মা'র কথা মনে পড়ে। তার বোনের কথা মনে পড়ে।

চা এনে দেবার পর নীরুর যেন হাত-পা লিট্‌পিট্‌ করছিল। রাত অনেক হয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকাল রাত একটা। গ্যাসের বাতি জ্বেলে সোনার ঝাল দিচ্ছে সবাই। ভারী ভারী নেকলেস তৈরী হচ্ছে। গোবিন্দ শেঠ বলে একটার দাম দেড় লক্ষ টাকা। কী সুন্দর নেকলেস। কত ভারী। নীরু এত সোনা কোনদিন দেখেনি। তার মায়ের যে নাক কড়াইটি ছিল তাও তার পার্টিবাজ বাপ বিক্রী করে দিয়েছিল। এ নিয়ে মা-বাপে ঝগড়া হোতো। মা বলতো 'ওরা পার্টি করে চাকরী পাচ্ছে। অমুক লোক চাকরী না করে পার্টি করেই ঘরদোর করলো, আর তুমি আমার নাককড়াই খেলে? তোমার একদম লজ্জা নেই। নীরুর বাপ-মা ঝগড়া করলে নীরু চুপ করে শুনতো।'

শেঠ বললো 'নোনু রান্না হইচে?' মজা করবার জন্যে নীরুকে 'নোনু' বলে শেঠ। নীরুরে একবার রাগ হয়। একবার ভালও লাগে। নীরু বলে 'হ্যাঁ'। 'লে শালা ভাত বাড়। লে লে সব গা তোল তো। উঠ উঠ থাক!' বলেই খিস্তী করল। সবচেয়ে ছোট বলেই শেঠ নীরুকে 'নোনু' বলে আদর করে।

পৃথিবীর কোথায় কি ঘটে গেছে আজ এরা কিছুই জানে না। গতকাল কি ঘটেছে তাও জানে না। এদের কাছে রেডিও থাকে তবু এরা প্রায় দিন খবর শোনে না। গান শোনে। নাচের গান। ওরা জেনে ফেলে দেশের কোন খবরই খবর নয়। রাজনীতির নেতারা রাজনীতি করেই জীবিকা চালাচ্ছে। তাদের তো পরচর্চাই কাজ, তাই এরা তাদের ঘেন্না করে। এরা বলে 'কামানি' চাই। 'কামাইকে লিয়ে আয়া হুঁ' জগতের অন্য দুঃখ, অন্য আনন্দ এরা কিছুই জানে না যেন। এরা কাজ করে। দিনরাত মাথা গুঁজে কাজ করে। কাজ। কাজে চুরি আছে কিন্তু ফাঁকি নেই একতিল।

সবার আসন করে পাশের ঘরে ভাত বেড়ে দিল নীরু। নীরুও ভাত খাবে। এই বয়েসে নীরুকে রাঁধতে হয়। ভাত দিতে হয়। সবাইকে খাইয়ে খেতে হয়। নীরু যেন এদের বালিকা বধূ।

শেঠ বলে 'ডালটা আলুনি কেন?' কেবলা চোখ বললো 'সাত্যিই আলুনি।' রাত প্রায় দু'টো সোনা পাড়ার লোকেরা এখনো অনেকে জেগে আছে। রতনপোলের রাস্তা শুনশান। একটা দোকান খোলা নেই। নিঃস্তব্ধ নিঃঝুম। মাঝে মধ্যে এক আধখানা ট্রাক ঘুরে যাচ্ছে গান্ধী রোড হয়ে। দু'রাস্তার দু'পাশে শুয়ে আছে কাঁথা চাপা মানুষ। যেন কলকাতা শুয়ে আছে রাস্তায়। দু'চারটে উটের ঘুম 'ধরেনি'। হাঁটুমুড়ে শুলেও চোখ বুজিয়ে জাবর কাটছে তারা।

'দড়াম্' করে এক লাথ মারলো নীরুর পাছায়। আচমকা উপুড় হয়ে পড়ে গেল। থালা ভর্তি ভাত ছিটকে গেল ঘরময়। অতর্কিত আক্রমণে কেউ যেন প্রস্তুত ছিল না। শেঠ গর্জন করে নীরুর বাপ-মার উদ্দেশ্যে গাল দিল।

শেঠকে সামাল দিল অন্যরা। 'আলুনি তো কি হবে? একটুখানি খেয়ে নাও'। 'এত্তরাতে' ইত্যাদি কথা বলে রাত কাটলো। শেঠের উপর একটু বিরক্ত হোল সবাই!

নীরু কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে গেল। তার খাওয়া হোল না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন নীরুর গা ছ্যাত ছ্যাত করছে। জ্বর। নিশ্চয়ই জ্বর। গোবিন্দ শেঠ আগের দিনের মতোই স্বাভাবিক। রাতের উত্তেজনা তাকে ছুঁতে পারে না। শেঠ অন্যদের মতো মদ খায় না। গুজরাতী বা বাঙালী মেয়েদের জন্যে লজে যায় না। গোবিন্দ শেঠের একটা নিজস্ব রুচি আছে। সেই রুচিবোধের জন্যে এই তল্লাটে সবাই গোবিন্দকে চেনে। গোবিন্দ নিয়মমাফিক কামানি করে। বাড়তি কামানি করে না। তাতেই সে যথেষ্ট কাজ পায়। ব্যাপারীরা কাজ দেয়।

শেঠ স্বাভাবিক হলেও নীরু স্বাভাবিক হতে পারে না। রাতে তার খাওয়া হয়নি। পেটে একুশ ফুট নাড়ী যেন দড়ি পাকিয়ে পুঁতির মালা হয়ে গেছে। নীরুকে দেখে গোবিন্দর মায়া হোল। কিন্তু নীরু বোঝাতে চাইল যে সে অত সহজ নয়। নীরু যে ক্ষুধার্ত সে কথা বুঝতেই পারছিল। রাতের ঘটনার জন্যে সে অনুতপ্তও বটে। সে মেজাজে বললো 'বৌমা, নাস্তা আনো তো।'

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

নাস্তা আনতে যেতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল নীরুর। দোতলার নীচের রাস্তায় দোকান। দু'জনের জন্যে নাস্তার প্যাকেটগুলো কিনে নিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে চোখে জাল পড়ে গেল নীরুর। যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন সে দেখলো যে তার মাথায় হাত বোলাচ্ছে গোবিন্দ শেঠ।

সে শেঠকে জিগ্যেস করলো 'আমার কি হয়েছে?'

শেঠ বললো 'কিচ্ছু না একটু অসুস্থ হয়ে গেছিস।'

গোবিন্দ যে নীরুকে মমতা দিয়ে ভালবাসে সেটা সবাই বুঝে ফেলল নীরুকে সুস্থ করার ব্যাপারে । নীরুর চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করল সে। দৈনিকের পথ্য ওষুধপত্র এসবের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনি।

ক'মাস হোল এসেছো। এখনো তেমন কোন কাজ শিখতে পারেনি নীরু। এখনো ছোকরা। এখন সে যন্ত্রগুলো চিনতে পেরেছে। সোনা গালাই করা শিখেছে। পালিশওয়ালার কাছে যেতে পারে। ওজনটা বুঝতে পারছে। হিসেবটা এখনো রপ্ত করতে পারেনি। দলাই দোকানের কাজ বুঝে আনতে পারে। তার কাটতে পারে চেন গাঁথতে পারছে। ম ়ল সূত্র গাঁথছে। বল তৈরী করতে পা ে। সোনার বল।

সোনার বল তৈরী করতে তার ভারী মজা হয়। সাদা তুলোর উপর সমান মাপের সরু সরু তারগুলোয় গ্যাসের বাতি দিয়ে ফুক্‌লেই মুহূর্তের মধ্যে কুঁকড়ে সমান ওজনের বল হয়ে যায়। সেই দিয়ে সোনার ছেলেরা তৈরী করছে সোনার বল।

নীরুর ভাল লাগছে সে একদিন লস্ পাবে। সেই দিয়ে তার বোনের জন্যে দুটো জামা কিনবে। মায়ের নাকের নাককড়াই আগে গড়িয়ে দেবে। খাউকুঁড়ে বাপটার জন্যে তার রাগ হয়। বাপটা তার কি যে করছে কে জানে। গোবিন্দ শেঠের কাছ থেকে একটা কাগজ চেয়ে নিয়ে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছে তার মাকে, 'মা' তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো, আমি যেন তাড়াতাড়ি কাজ শিখি। আমি লস পেলে তোমার জন্যে নাককড়াই আর বোনের জন্যে দু'টো জামা নিয়ে যাবো। মা বোন যেন আমার উপর রাগ না করে। বোন কবিতা মুখস্থ করেছে তো? আমি ফিরে গিয়ে ওর মুখস্থ ধরব। আগামী সরস্বতী পুজোয় বাড়ী যাব। পাক্‌কা দু'বছর হবে। গোবিন্দদা বলেছে পুজোর সময় আমি লস পাবো। আমি আর বোন দু'জনেই আবৃত্তি করবো। আরো কত কি লিখেছে নীরু।

নীরুর প্রথম প্রথম যেমন মন কেমন করছিল এখনো তেমনই মন খারাপ করে। সামনেই উত্‌ড়ান। তার পশ্চিমবঙ্গের গাঁয়ে পৌষ সংক্রান্তি। আমেদাবাদে উত্‌ড়ান। উত্‌ড়ান উৎসব। বাঙ্গালীরা একে উড়ান বলে। গেল বারে উড়ানে তেমন তার আনন্দ হয়নি। কিন্তু এবারে বড় ইচ্ছে তার সে আনন্দ করবে। কিন্তু কোত্থেকে আনন্দ করবে। এখনো তো লস্ পায়নি। প্যান্টের পেছনটা তালি মারা। ফুটপাতের চটিটা প্রায় ছিঁড়বে ছিঁড়বে করছে, কিন্তু ছিঁড়ছে না।

রোববার হলেই এই প্যাণ্ট পরেই আমেদাবাদের শহর দেখেছে নীরু। কখনো নীরুর সঙ্গে কখনো অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে। মসজিদ দেখেছে। মন্দির দেখেছে। রাগী মুসলমান দেখেছে। ফকির মুসলমান দেখেছে। হিন্দু-মুসলমানের বন্ধুত্ব দেখেছে। হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধ দেখেছে। মৃত্যু দেখেছে, জীবন দেখেছে। পুলিশকে উদাসীন দেখেছে। মুসলমানদের লেল্‌কাতে দেখেছে পুলিশকে। গুণ্ডাদের দেখেছে। শুকনো সবরমতী নদী দেখেছে। নীরু এগার বছরের বালক। তার মধ্যে এগার হাজার প্রশ্ন জেগেছে। এগার হাজার প্রশ্ন। কত মানুষ। কত ঘটনা। কত রকম। কিন্তু কেন? নীরু বালক। নীরু জানে না নীরুর উত্তর।

গত দু'দিন ধরে লক্ষ লক্ষ ঘুড়ি বিক্রী হচ্ছে আমেদাবাদ শহরে। মুসলমানদের ঘরে তৈরী হয় এই ঘুড়িগুলো। মূলত সারা বছর ধরে তারাই তৈরী করে। বিক্রী করে সবাই মেয়ে-মদ্দ সব। 'পতঙ্গ লো' 'তেরা পতঙ্গ মেরা পতঙ্গ' কত কি কথা। ওড়াবে সবাই। মকরের দিন আমেদাবাদে 'উত্‌ড়ান উৎসব।' বলা ভাল উড়ান গোটা শহর সেদিন মাটিতে থাকবে না।

নীরু ঘুড়ি বিক্রীর ভিড় দেখে অবাক হয়ে যায়। দোকানগুলোয় গিয়ে দেখলো অজস্র ভীড় দু'টো মেয়ে ট্যাকসী থেকে নেমে তিনশ ঘুড়ি নিল। সমস্ত দোকানগুলো যেন

দু'দিনের জন্যে 'পত্‌ঙ্গ দোকান' হয়ে গেছে। গোবিন্দ নিল দু'শ পঁচিশটা। দু'টো লাটাই নিল গোবিন্দ। 'সবাই মিলে উড়ানে উড়াবো।' নীরুকে গোবিন্দ বললে 'তুই একটু রেঁধে নিবি ভাই সকাল সকাল। মাংস খাব সবাই। রাতে পিঠে হবে।'

পিঠের কথা মনে হতেই নীরুর মায়ের কথা মনে পড়ে গেল। মায়ের কথা মনে হলেই মন খারাপ হয়ে যায় নীরুর। এই শীতে মা ঘরে বসে এখন বুঝি আস্‌কে পিঠে করছে। সরু চাক্‌লী করবে বুঝি সে। বোন নিশ্চয়ই ঝোলা গুড় আনবে। বাবা বোনকে বোক্‌বে গুড়ে মরা পিঁপড়ে ভাসবে বলে। ভাইয়ের উপর একটু রাগ হয় নীরুর, সে কেমন মায়ের কাছে আছে। সে মনে মনে বলে 'মা আজকে আস্‌কে কর না গো।' মুচকি হাসে নীরু।

গোবিন্দ বলে, 'বৌমা হাসছ কেন?'

সবাই হেসে ফেলে।

গোবিন্দ আবার ঠাট্টা করে স্বর ভেঙিয়ে বলে, 'তোমরা হাসছ কেন? বৌমা লজ্জা পাবে।'

হো হো করে হেসে ফেলে সবাই।

নীরু এসব কথায় কান দেয় না। কাল উড়ান। উড়ানের দিনে সেও ঘুড়ি উড়াবে। ঘুড়ি নয় 'পত্‌ঙ্গ'। যে বছর সে তিরিশ পয়সায় একটা ঘুড়ি কিনে ছ'বার তালি মেরে উড়াবার পর যখন ঘুড়িটা কেটে গিয়েছিল তখন খুব কষ্ট হয়েছিল তার। কঞ্চিতে কুলগাছের পাতাঝরা কাঁটা ডাল বেঁধে মাঠে মাঠে শেষ দৌড়ে ছিল বেগুনী রঙের একটা ঢাউশ ঘুড়ি ধরতে। পারেনি ঘুড়িটা ধরতে কিন্তু তা ধরবার জন্যে পাইরী পার হয়ে ডাকাতে মান্না পার হয়ে যাবার সময় কেঁদে মাটিতে পড়ে গিয়ে দু'টো পায়ের আঙ্গুল ছড়ে প্রচুর রক্ত পড়েছিল, তা নীরুর মনে আছে।

রাতে কখন ঘুমিয়েছে মনে নেই তার। কাল উড়ান বলে গোবিন্দ শেঠ আজ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। ডেকস্‌গুলো গোছ করে রেখেছে একদিকে। মাদুরের তলায় যে ধূলো সে ধূলোয় সোনা আছে। ধূলো বিক্রী করেও কয়েক হাজার টাকা আয় করে গোবিন্দ শেঠ।

সেই চটের মতো নোংরা মাদুরের বিছানায় শুয়ে পড়েছে। নীরুর পাশেই শুয়েছে গোবিন্দ। বরাবর গোবিন্দ নীরুকে কাছে নিয়েই শোয়। ঘুমের মধ্যে নীরু দেখে নীরুর মা মাইতি পুকুরের জলে উবুড় করা খালি কলসীকে বুকে চেপে সাঁতার কেটে মাছ খেদাচ্ছে। নীরুর বাবা যথারীতি বাড়ীতে নেই। পৈঠা থেকে ছোট্ট নীরু হাতের তালু বাজাতে বাজাতে বলছে 'মা আমি যাব। আমি যাব।'

'লে-লে-লে—' চীৎকারে যেন হৈ-হৈ করছে আকাশ। ছাদের উপর থেকে গোবিন্দ শেঠ ও পাড়া অন্যান্য প্রতিবেশীরাসহ দোকানের কারিগরেরা সবাইয়ের গলার শব্দে

নীরুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গা-হাত ম্যাজ ম্যাজ করছিল তার। আমেদাবাদের নয় শীতের সকাল যেন রসবতী কন্যার মতো ফেটে পড়ছিল। ঘাসের ঝাঁটায় ঝাঁট দিল মাদুরের উপর। দরজা জানালাগুলো হাট করে খুলে দিতেই নীরু দেখল মুগ্ধ সকাল। ছেলেমেয়েদের আনন্দের চীৎকারে বক্সের আওয়াজে যেন কথা শোনা যাচ্ছিল না কারুর। গোবিন্দ শেঠ বারবার হৈ হৈ করছিল দোতলার ছাদ থেকে।

নীরু ভাবল একবার যাই। আবার ভাবলো হাতের কাজগুলো সেরে নিই—বলেই সে রাতের বাসনগুলো ধুলো। ছ'বালতি জল পায়খানার চেম্বারের জন্যে সিঁড়ি ভেঙ্গে তুলল। স্নানের জল তুলল। জামা-কাপড়গুলো কাচলো। দ্রুত কাজ সারতে চাইলো নীরু। কাপড়টা মিলে দিয়েই ষ্টোভটা ধরিয়ে ভাত বসিয়ে দিল।

আজ আমেদাবাদে সূর্য উঠেছে সকাল সাড়ে সাতটায়। আখ-বজরা-কাপাস তুলোর মাঠ পেরিয়ে সূয্যটা যেন তাড়াতাড়ি চলে এসেছে আজ। শীতের টানা বাতাস আছে উত্তরের দিক থেকে। কনকনে শীতের একটু যেন কাঁপুনিটা কম। কিন্তু তেমন কম নয়।

পাশের বাড়ীর একজন ক'দিন আগে মারা গেলেও শোক তেমন কারুরই নেই। গোবিন্দর হৈ হৈ চীৎকার তাদের ছাদকে যেন অনন্য করে তুলেছিল। একবার লোভ হোল নীরুর। ছাদে যাই। সমস্ত আনন্দ কি আজ ছাদে এসে হাজির হয়েছে। অদম্য প্রেরণা নিয়ে নীরু ছাদে ছুটে গেল।

উড়ানেব এত আনন্দের মধ্যেও গোবিন্দ শেঠ নীরুকে একটু ব্যঙ্গ মিশ্রিত ঠাট্টা করে বললে, 'বৌমা এয়েচো? এচো! এচো! রান্না হয়েছে বৌমা?' শেঠ-এর কথায় একটু ম্লান হোল নীরু। নীরুর মনে হোল শেঠ কী পাষণ্ড। আজকের আনন্দের দিনে তাকে কেউ নির্মল অভিনন্দন জানাচ্ছে না। বরঞ্চ তাকে মৃদু ব্যঙ্গ করছে। এক আশ্চর্য অনুভূতি, তা সত্ত্বেও নীরুকে মুগ্ধ করে তোলে। নীরু কারুর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে ছাদের উপরে উঠে আকাশের দিকে তাকায়। মুগ্ধ বিস্ময়ে অপরূপ লাবণ্য দেখে আকাশের। একি আকাশ। আকাশে যে লক্ষ-কোটী ঘুড়ির বাহার। আকাশে আজ ঘুড়িটা উঠেছে বলে হাজার হাজার পাখীও যেন আজ আকাশকে ঘিরে ফেলেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ দিগন্তে প্রসারিত করে তার চোখ। আজ যেন আকাশ নেই। আজ যেন ছাদ নেই। আজ যেন সমস্ত শহরটা সমস্ত তরুণ-তরুণীদের নিয়ে ছাদে উঠে এসেছে। সে আত্মহারা হয়ে যায়। মনে মনে বলে 'এত্তো ঘুড়ি। এত্তো!' দূর বিস্তীর্ণ আকাশে ঘুড়িগুলো পতঙ্গের মতো লাগছিল। সমস্ত জাতের লোক, সমস্ত ধর্মের লোক বর্ণের লোক নারী পুরুষ যুবতী বুড়োরাও উড়ান খেলছে।

সামনের তেঁতুল গাছটায় পাতা দেখা যাচ্ছে না। যেন সহস্র সহস্র ঘুড়ি কেটে এসে পড়েছে। কেউ ধরবার লোক নেই। পাড়বার লোক নেই। এটা নীরুর গাঁ হলে গাছে উঠে সব কটা ঘুড়ি পেড়ে নিত।

গুজরাতী ছেলেমেয়েরা বক্স বাজিয়ে প্রায় ছাদের উপর নাচছিল। তাদের মধ্যে কোন বিকার নেই। কোন বিকৃতি নেই কেবল উড়ান নাচের আনন্দে মেতে উঠেছিল গোটা শহর।

আকাশের ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে বালক নীরুর হঠাৎ মনে হোল যেন লক্ষ-কোটী বেলুনে বেঁধে আমেদাবাদ শহরটা আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। আজ তার রাস্তা নেই। বাস নেই। খটখটি নেই। ট্যাক্সি নেই। লস নেই। কিছু নেই। দোলায় চেপে উড়ে যাচ্ছে আকাশের নীল ঘন প্রান্তরেখায়। আমেদাবাদ যেন আকাশেই হারিয়ে যেতে চায়।

প্রায় হঠাৎ। এমনি হঠাৎই। ওরা একটা কাটা ঘুড়ির সূতোর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বললো, 'ধর' 'ধর'। সঙ্গে সঙ্গে নীরু লাফিয়ে ঘুড়ির সূতোটা ধরতে আরসি পিলারের একটুখানি করে বাড়তি রডগুলোয় পা লেগে ছিট্‌কে পড়লো নীরু।

মুহূর্তের মধ্যে নীচের কুঁয়োর জলে ধোবার জন্যে যে এঁটো বাসনগুলো কাঁড় হয়েছিল, সেই এঁটো বাসনের উপর আছড়ে পড়লো মহাশব্দ করে।

গোবিন্দ শেঠ ছাদ থেকে কিছু একটা করবার আগেই নীচের গুজরাতী মুসলমানী বৌদি কুয়োতলা থেকে আর্তনাদ করে উঠলো, 'নীরু, তমে এ কেয়া কিয়া' .....'

তারপর অনেকদিন।

নীরুর মা, তোমার মন কেমন করে না?

দয়াবতী

কথাটি স্থির থাকলো না। আর পাঁচটা কথার চেয়েও অধিক দ্রুততায় কথাটি চাউর হতে থাকলো। কথা তো কথাই। শব্দ মাত্র। শব্দ কখনো জব্দ হয়ে যায় কখনো আগড় ছাড়া অর্গলমুক্ত হয়ে মানুষের মুখে অনর্গল বাজতে থাকে। তখন শব্দকে জব্দ করা যায় না। শব্দই জব্দ করে দেয় শব্দের মানুষকে।

গ্রামটির নাম যাই হোক কেন বাংলার আর পাঁচটা গ্রামের সঙ্গে এর তফাত একনজরেই পড়ে। মস্তবড় এক জলাশয় দ্বিখণ্ডিত করে সে বহু বছর আগে থাকেই ঝম্‌ঝম্ করে রেল যায় গ্রাম কাঁপিয়ে। হেথায় সব আছে—স্কুল, বাজার, ব্যাংক, ডাকঘর, পাকাবাড়ী, মাটিবাড়ী সবই বর্তমান। প্রচুর পয়সার মালিক ব্যবসাদার যেমন আছেন, তেমনি মোটা মাইনের কর্মচারীও দু'চারজন আছেন। জোতদার আছেন, ভাগচাষী আছেন, আছেন হাভাতেরাও বড় কষ্ট করে।

এ গাঁয়ে কমবেশী চেনাজানা প্রায় সবাই। মাতামাতি রাগারাগি ভোট মারপিট তন্ত্রমন্ত্র সব কিছুর দারুন সহবস্থান। খুব খারাপ নেই এ গাঁয়ের লোকজন। ভিডিও পার্লারে লাস্যময়ীদের অবাধ দেহ দেখার আয়োজন আছে যথেষ্টই। এত সব আয়োজনের মধ্যে সেই প্রাচীন সংস্কৃতি পুজো পার্বনের ভীড় কমেনি এখানে।

ক'দিন হোল গাজন শুরু হয়েছে। এ গাঁয়ের চড়ক, শীতলা পূজায় লোকজন একটু জাঁকিয়ে ভীড় করে। বাড়ীর ভক্তরা শিবের দেউল বাঁশ নিয়ে ভোগ মুদতে যায়। বামুন যায়, ঢাকী যায়, কাঁশী যায়, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা তাদের সঙ্গে যায় পাড়ার নাবালক ছেলেমেয়েরা।

সন্ন্যাসীরা চীৎকার করে হাঁকে 'বাবা শীতলানন্দের চরণে সেবা লাগে, মহাদেব' এই স্লোগান ধর্মীয় স্লোগান। এই স্লোগানে শৈব সম্প্রদায়ের প্রতি আরোপ আছে, কিন্তু এ গাঁয়ে সেই শৈব সম্প্রদায় পৃথকভাবে নেই। এখানে যারা তান্ত্রিক মতে কালীপুজো করেন আবার তারাই হরেকৃষ্ণ নাম নিয়ে অষ্টম প্রহর অনুষ্ঠানে হৈ হৈ করে রাত জাগেন। আবার তারাই মুসলমান পাড়ার কোরাণ পাঠের অনুষ্ঠানে ভীড় করে কোরাণের নির্দেশ শুনেন। এভাবেই এই গাঁয়ের বুনট। এই গাঁয়ের নাম বনগ্রাম।

বনগ্রাম এখন নতুন হাওয়ায় অস্থির। যারা আগে ভোটের সময় রাজনীতি করতেন তারা এখন বছরের প্রায় সময় রাজনীতিতে মেতে গেছেন। যারা স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলেন তাদের একজন আছেন এ গাঁয়ে। তিনি এখন কোন সম্মান পান না, মাত্র ক'টাকা পেনশন ছাড়া। দেশের লোকেরা তাদের খুব বেশী কদর করেনি। কেননা তাদের পরিশ্রমের গল্প তারা জানবার চেষ্টাও করেনি বলে। সে সময় একদল লোক সত্যিই যে পীড়ন সহ্য করেছিলেন তাদের সম্মান আমরা কতটুকুই দিই। দিয়েছি কি?

কথাটা চাউর হচ্ছিল। একটি চিনির দানাকে কেন্দ্র করে যেমন বিভিন্ন প্রকার পিঁপড়ের জমায়েত হয় এবং অনেক হাড্ডাহাড্ডি তর্কবিতর্কের পর চিনির দানার মালিকানা নির্ধারিত হয় ঠিক তেমন করেই কথাটি আবর্তিত হচ্ছিল।

হরিণ যখন জন্মায় সে তার রূপ নিয়ে জন্মায়। সেই রূপে মুগ্ধ হয় বাঘ। অবশেষে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে খিদের জ্বালায়। এতে হরিণ যদি বলে 'তুমি মুগ্ধ হও কেন' কিংবা বাঘ যদি বলে 'তোমার এত রূপ কেন' তবে একথার কি উত্তর হবে দয়াবতী তা জানে না।

দয়াবতী বনগ্রামের রূপবতী বৌ। দূর গাঁয়ে তার বাবার বাড়ী। এ গাঁয়ে দয়াবতী এসেছে প্রায় কুড়ি বছর। দয়াবতী এখন ত্রিশোর্ধ রমণী। দয়াবতী সুন্দরী।

এ গাঁয়ে দয়াবতীকে সবাই চেনে। চেনে না তার বর হরিপদ। সে যখন এ গাঁয়ে বউ হয়ে এসেছিল তখনও সে কিশোরী। পনের বছরের কিশোরী। ছিপ্‌ছিপে মিষ্টি টুকটুকে ছোট্ট মেয়ে। কোমর ভর্ত্তি চুল। পায়ের পাতাগুলো বড় মিষ্টি। বেশ সুন্দরী। ঠোঁট দু'টি পিট্‌পিট্‌ করতো হাসিতে। চোখের চাহনিতে একটা মুগ্ধ বিনয় ছিল তার। ছোট্ট একটা আঁচিল বাঁ দিকের গালে ছিল উঁচু হয়ে। দয়াবতী তখন বালিকা। কিশোরী। বাড়ীর সামনে দিয়ে আইসক্রীমওয়ালা গেলে আইসক্রীম কিনে খেতো। তার বর হরিপদকে কতবার বলেছে 'লেবেনচুস্ এনো', হরিপদ লেবেনচুস্ আনতো কিনে।

হরিপদ রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো। দলের সঙ্গে কাজ করতো। কাজ করতে তাকে ভালই লাগতো। রাজমিস্ত্রীর খাতে কাজ করতে করতেই সে তাড়ি খাওয়া, বিড়ি খাওয়া, দক্তা ইত্যাদির নেশা ধরেছিল। এসব করতে করতে একদিন চুল্লু-হু'শ আরো কতকি জেনে গিয়েছিল সে। তারপর সে ফিরতো মাতাল হয়ে।

এসবের কতবার কতো বিরোধিতা করেছে দয়াবতী। কত কেঁদেছে। পায়ে হাতে ধরেছে। বায়না করেছে। রাগারাগি করেছে। বাপের বাড়ী চলে গেছে কতবার কিন্তু দয়াবতী হরিপদর নেশা ছাড়াতে পারেনি।

এই নেশার মধ্যেই দয়াবতীর ছেলে মেয়েরা জন্মেছে। বড় হয়েছে। এই নেশার মধ্যেই দয়াবতীর দিন যায় রাত যায়।

দয়াবতীর বাবা ছিল কানা। সে ভিক্ষে করতো তার স্ত্রীর হাত ধরে। তাই দয়াবতী সুন্দরী হয়ে জন্মেও সে বড় ঘরে যেতে পারেনি। বড় মানুষের ব্যাপারই তো আলাদা। তারা ভিখিরীর ঘরে বিয়ে করবেই বা কেন। ভিখিরি মেয়ের সঙ্গে, সুযোগ থাকলে সুযোগ নেওয়া যেতে পারে, মজা করা যেতে পারে কিন্তু তাকে বৌ করা যেতে পারে না। আর যাই হোক ভিখিরী দয়া পাবে আত্মীয়ের মর্যাদা পাবে না। কেননা আত্মীয়ের মর্যাদা পেতে হলে তাকে আর্থিক মানের সামনে দাঁড়াতে হবে। দয়াবতীর বাবার পক্ষে

এটা সম্ভব ছিল না। তাই ভিখিরী বাবা দয়াবতীর বিয়ে দিয়েছিল রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে। সেই বালিকা দয়াবতী আজও বনগ্রামের দয়াবতী বৌ। দয়াবতীর কথা চাউর হয় তাই সহজে।

হরিপদর নেশা ক্রমশঃ বাড়তে থাকলো। একটু মাত্রাতিরিক্ত। তিনটে মেয়ে হওয়ার পর হরিপদ যেন বেশী মাতাল। মদে চুর থাকলো। মদ খেতে থাকলো বেশী। দয়াবতীকে দিনরাত খোঁটা দিতো 'মাগী একটা ছেলে দিতে পারলিনি।' দয়াবতীর এ নিয়ে দুঃখ ঢের। সে ছেলে পাবার জন্যে তার বুকে ব্যথা কম নেই। বুক চিরে দেখাতে পারলে হয়তো সে খুশী হোত। সে কাঁদে। চোখের জল মোছে। একটা বেটা ছেলের জন্য সে কত মানত করে। শিব, শীতলা, দুর্গা, সরস্বতী কাউকেই বাদ দেয়নি। সবাইকে মানত করে 'একটা ছেলে দাও হে ঠাকুর। একটা বেটা ছেলে দাও' সেকথা কেউ পূরণ করেনি।

সে রাতে হরিপদ যখন তাকে পীড়ন করতে করতে বলছিল 'একটা ছেলে দিতে পারলিনি তুই মাগী, তোর কাছে শোব কি, শুলেই ত মাগী বিয়োবি।'

তখন দয়াবতীর লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল। বলছিল 'আমার দোষ কোথায় আমি তো জানি নি। কেন আমাকে বার বার দোষ দাও তুমি। আমি কি সত্যি দোষী?'

দয়াবতী তার দোষ জানে না। সে জানে যা হবার তা হবে, আমার কি করবার আছে। সে তাই ঠাকুর দেবতাও মানে না। সে ভাবে তাদের উপর তার ভক্তিও নেই।

হরিপদর মনের জোর কমে যায়। ইদানীং কাজও কমে যায় তার। কাজই বা বাড়ে কত। বাড়ায় কত। দিন আনা দিন খাওয়ার সংসারে কষ্ট করেই চলতে হয় তাকে। চালাতে হয়। দয়াবতী বলে 'এভাবেই চলব আমরা। বসে থাকলে তো চলবে না।' তাই দয়াবতীও কাজ করে। লোকের ফাইফরমাস খেটে দেয়। খামারের কাজ করে। মাঠের কাজ করে দেয়। হাটে বাজারে যায়। বসে থাকে না। নিজের গা-গতর নেড়ে যতটা আসে ততটাই ভাল।

দয়াবতী জেনেছে গরীবদেরই যত অভাব। বড় লোকদের অনেক আছে। কিছু থাক বা না থাক তারা তো পাকা ঘরে বসবাস করে। পাকা ঘর। দয়াবতীর ঘরে চারটে সিমেন্টের খুঁটি লাগাতে পারেনি। খড়ের চালের পরিবর্তে টিন বাদ দাও টালিও দিতে পারেনি। পারবেই বা সে কি করে, হরিপদর কাজ তো দৈনিক থাকে না। থাকলেও দাম তো নিয়মিত পায়নি। দাম পেলেও হরিপদর হাতখরচ তো হয়ই; তাছাড়াও দৈনিকের সংসার চালানো ওষুধপত্তর কাপড় চোপড় আত্মীয় স্বজন কানা শ্বশুর সব মিলিয়ে দায়দফা মিটিয়ে তার বাঁচা না বাঁচা দুটোই সমান হয়ে দাঁড়ায়।

দয়াবতী শুনেছে সরকারী মাইনে যারা পায় তারা অনেক পায়। অনেক টাকা। তাদের কাজের চেয়ে, মাথার চেয়ে পরিশ্রমের চেয়ে অনেক অনেক বেশী পায়। দয়াবতী জানে না কেন ওদের বেশী টাকা দেয়। কেনই বা তাদের টাকা নেই। কাউকে দোষ দেয় না সে যেন দয়া চায় সবারই।

দয়াবতী যখন চাষী-মাস্টারের ঘরে কাজ করতো অর্থাৎ নিজের ঘরের কাজ সেরে ওদের খামারের কাজ করে দিতো, মাঠের কলাই উপ্‌ড়ানো, পাট নিড়ানো, আলু বাছাই কখনো কখনো ধান সেদ্ধ শুকনো ইত্যাদি এসব করে মাস্টার গিন্নীর গোয়াল থেকে আড়াই শ টাকা দিয়ে একটা এঁড়ে বাছুর কিনেছিলো। দয়াবতী যখন এঁড়ে বাছুরটি কিনে এনেছিল তখন পাড়ার সবাই হেসেছিল, 'লোকে বখ্‌না বাছুর কেনে আর তুই এঁড়ে বাছুর এনেছু' দয়াবতী তাদের কিছুই তখন বলেনি। হরিপদ পচাল করে বলেছিল 'ঢং করে এঁড়ে বাছুর আনা হইচে।' দয়াবতী তখন ফিক্ ফিক্ করে হেসেছিল। কোন উত্তর দেয়নি। হরিপদর ভয় ছিল যদি বৌ তাকে লাঙ্গল করতে বলে তাহলে সে পারবে না। তাই বিরক্তই হয়েছিল। এখন সেই বাছুরটি বাছুর নয়, ষাঁড়। রীতিমতো ষাঁড়। অনেক বলে কয়ে বুঝিয়ে হরিপদকে মত করিয়েছে সে 'গাই দেখানো'র কাজ শুরু করবে।

দয়াবতী এই কাজটা শুরু করত না, হয়তো বা না করলেও চলতো তার, কিন্তু ষাঁড়টি ক্রমশ বড় হলে মাঠে বাঁধা থাকলে খুঁটোয় বাঁধা থাকলে লোকে এসে দয়াবতীকে বলতো 'আমার গাইটা দেখিয়ে নিই তোমার ষাঁড়টা দিয়ে।'

দয়াবতী কাজটা জানতো না। যাদের গাই আছে, তারাই শিখিয়ে দিলো দয়াবতীকে। হরিপদও শিখে গেল কাজটা। তারপর একটা খাটাল তৈরী করে 'কাজটা শুরু করে দিল'। কাজের মজাও পেলো তারা হাতে কুড়ি টাকা গুঁজে দিয়ে গেল যখন। দয়াবতী ভাবলো এটা 'আশীর্বাদ'। হরিপদ ভাবলো 'বেশতো।'

বনগ্রামের উপর দিয়ে হুইসল বাজিয়ে ট্রেন কোথা যায় কোথা থেকে আসে তার অনেক গল্প শুনেছে দয়াবতী, কিন্তু সে কোথাও যায়নি রেলে চেপে। বনগ্রামে বউ হওয়ার আগে রেল দেখেনি সে। রেলে চাপা তো দূরের কথা ভাবাও তার কাছে স্বপ্ন ছিল একদিন। দয়াবতীর ঘর থেকে রেল লাইন দেখা যায়নি। হু হু করে রেল ছুটে রেলের দিকে। কত মানুষ জন লোক লস্কর নিয়ে রেলের ছোটার অন্ত নেই।

দয়াবতীর কাছে এসব নিঃপ্রয়োজন। নিঃপ্রয়োজন বটেই কেন না তার কাজ তো রেলে নেই। ব্যাংকে নেই। বরং বাজার ভাল। দোকান ভাল। দোকান দরকার।

দয়াবতী জ্যোতিবোসকে দেখেনি। কখনো তার মিটিং শুনেনি। বনগ্রামে তো জ্যোতিবসুর মিটিং হয়নি। কিন্তু জ্যোতি বোস নাকি লোকটা ভাল। অনেক কথা শুনিয়েছে পার্টির লোকেরা। একবার এক বছরের ছেলে ঘরে রেখে সে রেলে চেপে কলকাতা গেছিলো জ্যোতিবোসের মিটিঙে। সে মিটিঙেও জ্যোতি বোসকে দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পায়নি। হাওড়ার স্টেশন থেকে নামিয়ে কলকাতা শহরের কত সহস্র রাস্তা ধরে মিছিল হেঁটে যখন বিগ্রেডে পৌঁছেছিল তখন টইটম্বুর বিগ্রেড ডিঙিয়ে তাকে দেখার কোন সুযোগ ছিল না। পরের দিন পার্টির একজন কর্মী এসে গণশক্তির ছবি দেখিয়ে বলেছিল 'এটা জ্যোতি বসু'।

প্রথম রেলের চাপার অভিজ্ঞতার মতোই জ্যোতি বোসকে ছবিতে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল দয়াবতী। কিন্তু দয়াবতী জানে না জ্যোতি বোস তাদের অবস্থা ফেরাবে কি করে।

পার্টী কর্মীরা বলেছিলো, ''চলো, মিটিঙে চলো মিছিলে চলো, সমর্থন করো, ভোট দাও; তোমাদের আমরা দেখব।'

হরিপদ এসব কথায় বিশেষ বিশ্বাস করে না, গুরুত্বও দেয় না। সে একজনের মুখের উপর বলেছিল, 'কি দেখবে তোমরা? আমার গামছা কেড়ে নেবে? নাকি ধুতি পরিয়ে চেয়ারে বসাবে?'

মাথা মোটা পার্টী কর্মী তাকে 'চীন, রাশিয়া, কিউবা'র কত কি কথা বলে কি বলে ছিল: সে নিজেও বুঝে নি, আর হরিপদও শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেনি।

হরিপদ তাকে ফের জিগ্যেস করেছিলো তুমি কি বললে বুঝতে পেরেছো?'

পার্টি কর্মীটি বলেছিল, 'মাথা মোটা বুঝবে কি করে?'

হরিপদ বলেছিল, 'তা বটে?'

কোন তর্ক বাড়ায়নি সে। সে কোন মিটিঙেও যায়নি, মিছিলেও যায়নি। ভাল লাগেনি তাকে। দয়াবতীকে ডাকলে দয়াবতী যায়। গল্প করে কথা বলে। হাসে। না বুঝতে পারলে কিছু বলে না কিন্তু সে যায়। যেতে পছন্দও করে।

* * *

দয়াবতী একদিন জিগ্যেস করেছিলো, 'হ্যাগা মাস্টার তোমরা কত টাকা বেতন পাও।'

কর্মীটি বলেছিল 'সরকার কিছু দেয়।' ঠিক কত টাকা দয়াবতী জানে না। কর্মীটি বলেছিল 'মাস্টারদের বেতন দেয় ঠিকই, চাকুরেদের বেতন দেয় অনেক কিন্তু তাদের অনেক পড়তে হয়েছে। কত পড়েছে বল দেখি।'

'পড়লেই যদি হবে তবে ওদেরও তো পাওয়া উচিত। তারাই বা পায় নি কেন?'

কর্মীটি বলেছিল 'সীমাবদ্ধতা বলে একটা কথা আছে জানো। দিল্লী টাকা দেয়নি বলে আমরা অনেক কিছু পারিনি।'

দয়াবতী বলেছিল 'দিল্লী টাকা না দিলেও যদি তোমরা অনেক বেতন পাও তবে আমরা কি পাব ছাই। শুধু মিটিং করো, মিছিল করো।'

কর্মীটি বলেছিল 'হবে। হবে।'

'হবে তো নিশ্চয়ই কিন্তু হবে কবে? কত বছর তো গেল ঘর তো এখনো হলোই না।'

'সতীশ মাস্টার কথা দেয় কথা রাখবার জন্যে। আমি যখন কথা দিয়েছি তখন হবেই।' কর্মীটি বললো।

দয়াবতী বললো, 'সতীশ ঠাকুরপো! তোমাদের রাজনীতি বুঝিনি আমি তোমরা ডাক যাই। আমার এই মেয়েরা এদের নিয়েই তো ভাবনা। এখনো কিন্তু কোন সাহায্য পাইনি তোমাদের।'

সতীশ মাস্টার দয়াবতীর গাল টিপে দিয়ে বললো, 'দয়াবতী দয়া করলে সব হয় বৌদি। হয় না এমন কথা নয়।' আরো অনেক গল্পগুজব করে সতীশ মাষ্টার চলে গেলে দয়াবতীর বড় মেয়ে অনু বললো, 'মা সতীশ কাকু তোমার গাল টিপলো কেন? বাবাকে বলবো।'

দশ বছরের বালিকাকে কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে হাম খেয়ে দয়াবতী অনুকে বললে, 'একথা বলতে নেই।'

দয়াবতী যেদিন প্রথম রেলগাড়ী চড়ে কলকাতা থেকে ফিরে এসেছিল সেদিন কি মজা লেগেছিল তার। বাল্যকালে কত বালক-বালিকা ট্রেনে চড়া অভ্যেস করেছে দয়াবতী কিনা বুড়ো বয়েসে রেলে চেপে তার আনন্দ সে লুকোতে পারেনি।

কোন রকমে একটা শীট জানলার ধারে ম্যানেজ করে নিয়ে সে যেন দুনিয়াকে জেনেছে। এতদিন অন্ধ কূপের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে যেভাবে মরেছিল আজ যেন তার জীবন নদীর মতো উচ্ছল হয়ে গেছে।

কলকাতা থেকে ফিরে সে হরিপদকে উচ্ছলতার কথা জানাতে চেয়েছিল কিন্তু সে জানাতে পারেনি। কেননা হরিপদ একটু বেশীই খেয়েছিল আজ, তাই সে ঘুমিয়ে গেছে নেতিয়ে গেছে বেশীও। দয়াবতী ডাকার চেষ্টা করেও তার ঘুম ভাঙাতে পারেনি।

কখনো অবহেলা, কখনো উদাসীন হরিপদ, কখনো মদে উন্মত্ত হয়ে উঠোন কাঁপিয়েছে। কিন্তু বিলাসিনী দয়াবতীর সঙ্গে তার বোঝাপড়ায় ভুল হয়নি। ভুল হয়েছিল যা, তা আগেই ছেলে হওয়া নিয়ে।

এরপর অনেক দিন অনেক মাস অনেক প্রহর এভাবেই কাটালেও দয়াবতীর অভাব ঘুচে যায়নি। ঘোচাতে পারেনি।

এ বছরের চড়কে সুখ নেই তাদের। গেল মাসের অসুখ বিসুখে হয়রান দয়াবতীর যেটুকু টাকা ছিল সব খরচ হয়ে গিয়েছিল। ষাঁড়টাও ক' বছর তো কম পয়সা দিল না। এখন একটু বুড়ো হয়েছে যেন। তারই ক' টাকা বাঁচিয়ে চড়কের দিনে মেয়েদের হাতে পয়সা দিল। তারপর রেল লাইন ডিঙ্গিয়ে মাড়োতলায় চড়ক দেখার উদ্দেশ্যে নিকেলেই বেরুল দয়াবতী। দয়াবতীর সাজার মতো কিছু নেই। গেল পুঁজোয় যে আটপেড়ে শাড়ীটা কিনেছিলো সে শাড়ীটাই ধুয়ে তুলে রাখা ছিল। সেই শাড়ীটাই পরে নিল সে। আয়নার সামনে গিয়ে চুলটা আঁচড়ে নিল। কপালে সিঁদুরের টিপ পরলো একটা। মুখটা মুছে নিল আঁচল দিয়ে। কপালে সিঁদুর দিয়ে একটু সিঁদুর বাঁহাতের লোহায় ছোঁয়ালো। এসবটাই তার স্বামীর কল্যাণ।

পই পই করে তার মা বলে দিয়েছিল, 'মাগো স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ। নাহলে স্ত্রীর সুখ কোথায়।' একথা মানতো দয়াবতী কিন্তু এখন আর মানে না। সুখ তো একরকম হয় না। 'মা যা করে সুখ পায়, আমি তাতেই সুখী হবো তার মানে নেই।' তাই মায়ের

নির্দিষ্ট সুখ না বুঝেই দয়াবতী সাজিয়ে নেয় তার কথাগুলো, 'সুখ পেতেই হবে, যা খুঁজলে সুখ পাবো তা খুঁজে বের করতে হবে।' দয়াবতী তাই সুখ খোঁজে।

চটিটা কি পায়ে দেবে দয়াবতী। একবার ভাবলো সে পরবে। আবার ভাবলো 'না পরবো না।' সে তো ঠাকুর তলায় যাচ্ছে। জুতো পরলো না সে ইচ্ছে করেই।

আজ যেন দয়াবতীকে সবাই দেখছে। একটু হলুদ শাড়ীতে দয়ারতী যেন দয়াবতী নেই রূপবতী কন্যা। তার শরীরের গড়ন যেন আগাপাছতলায় উজ্জ্বল আলোর মতো বর্ণময় হয়ে উঠেছে। দয়াবতী হাসে। তার হাসি যেন আলোর মতো শুভময়। তার পরিচিত লোকেরা তাকে বলে 'দারুণ লাগছে বৌমাকে।' কেউ বলেছে, 'বৌদিকে দেখতে লোভ হয়।' সমবয়সী ভাসুরপো তাকে 'কাকী' বলে। সে বলেছে 'উঃ খামচে দিতে ইচ্ছে করে।'

দয়াবতী কারো কথায় ক্ষুব্ধ হয়নি। রাগ করেনি। বিষণ্ণ হয়নি কারোর কথায়। সে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করে যে তাকে নজর না করে কেউ পারে না।

দয়াবতী পা ফেলে ধীরে। পদবিক্ষেপ অতি মৃদু। কিন্তু লাবণ্য যেন ঠিকরে পড়ে। পথচারী তার গালের দিকে তাকায়। তার ডান দিকের গালের যে বাদামী আঁচিলটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই উজ্জ্বল আঁচিল পথচারীকে পাগল করে দেয়। অতি সাবধানে পথ চলে দয়াবতী। তাই তার গা থেকে আঁচল খসে যায় না। কাপড় এলোমেলো হয় না। তার মৃদু পদ সঞ্চারণে ভার নম্র নিতম্ব দু'টি মৃদু সঞ্চারিত হলে পিছনের মানুষবে সেদিক তাকিয়ে মোহগ্রস্থ করে তোলে। দয়াবতীর পায়ের পাতায় অদ্ভুত নম্রতা। আঙ্গুলের নখগুলিতে যেন নখদর্পণ বসানো রয়েছে। তার জিভ-দাঁত-নাক-ভুরু-চোখের পাতায় যেন আশ্চর্য হিম জড়ানো রয়েছে।

দয়াবতী গান জানে না। দয়াবতী কান্না জানে। দয়াবতী প্রেম জানে না দয়াবতী সহবাস জানে। দয়াবতী ভালবাসা খোঁজে। ভালবাসা পায় কিনা কে জানে। কিন্তু তার ইষৎ ক্ষীণ কটিদেশ উন্নত বুকখানি অতি যত্নে ঢেকে দেয় আঁচল দিয়ে। গলায় তো হার নেই। সে পাবেই বা কোথায় তাই গলদেশ সে খোলা রাখে। তা সে ঢেকে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। অথচ মানুষের চোখ দয়াবতীর চোখ থেকে নামতে নামতে নাক গাল ঠোঁট চিবুক বেয়ে কণ্ঠ, কণ্ঠের আরো নীচে ক্রমশ নীচে নামতে থাকে।

হরিপদ অবশ্য বৌ-এর প্রশংসা শুনেছে। একটা মদ্যপ রাজমিস্ত্রীর সুন্দরী বউ তার সহকর্মী বা উচ্চতর কোন সাহসী মানুষের ক্ষেত্রেই লোভনীয় বৈকি। কেউ বেশী প্রশংসা করলে বিরক্ত হয়ে হরিপদ বলেছে 'আমার বৌ-এর এত প্রশংসা কেন বল দিকি? লিবি?'

'তুই মাগী এত সুন্দরী কেন?' এই নিয়েও এক দু'বার ঘরে গণ্ডগোল হয়েছে। সেসব চাপা পড়লেও এখন যেন সেরকমই উত্তেজনা থাকে দয়াবতীর দর্শকদের। 'দর্শক' না বলাই ভাল।

বনগ্রামের চড়ক মেলা ত্রিশ-বত্রিশটা গাঁয়ের সেরা মেলা। সাত দিনের মেলা কিন্তু

ভীড় হয় শেষ দিন চড়ক সংক্রান্তিতে। অন্তত তিনশ সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের সেই আর্ত চিৎকার ঃ

'তোমার ভক্ত তোমায় ডাকে'।

'ব্যোম্!'

'মহাদেব—'

'বাবা শীতলানন্দের চরণে সেবা লাগে—'

'মহাদেব।'

ধুনো জ্বেলে, ধূপ পুড়িয়ে, উপোষ কোরে, প্রণাম সেবা খেটে এক আশ্চর্য্য পুজো এই চড়ক পুজো।

দয়াবতীকে যারা চেনে তারা কেউ না কেউ অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। 'চলো আমিও যাব।' দয়াবতী ঠিক উদাসীন থাকে 'যেতে হয় চলো, না গেলেও ক্ষতি নেই।' কিন্তু যে যায় তার মনে হয় 'একটু সঙ্গে গেলেও ভাল যে লাগে।' দয়াবতীর সঙ্গে কথা বলার জন্যে একবার ধনা বেষ্টমের বউ ধনাকে ঠেঙিয়েছিল। কেন সে দয়াবতীর সঙ্গে কথা বলবে। ধনা বেষ্টমের কলার ধরে টেনে এনে ঘরে খিল দিয়ে বলেছিল 'কি বলবি বল। আমাকে বল। আমি থাকতে তোর কথা বলার বাঈ অত কেন? বল্ আমার সঙ্গে কথা বল।' বলেই সে গায়ের কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফালাফালা করে কাণ্ড ঘটিয়েছিল। ধনা বেষ্টমের খুব ইচ্ছে হলেও সে আর দয়াবতীর সঙ্গে মেশার চেষ্টা করেনি।

হরিণের দোষ কি বলো। সে তো জন্মগত কারণেই সুন্দর। সে সৌন্দর্যে তুমি মুগ্ধ হলে হরিণের কি করবার আছে বলো। হরিণ কি করবে?

ভীড়! প্রকাণ্ড ভীড় দেখে দয়াবতী যেন হারিয়ে গেল। সে যেন জনসমাগমে একা। তার কেউ নেই, কোথাও নেই। তার বাড়ী নেই, ঘর নেই, স্বামী নেই, কন্যা নেই, একা ভীড়ের স্রোতে যেন স্রোত। ভারী মজা হয়েছে তার।

কিছু কি কিনবে দয়াবতী। কীই বা কিনবে। গরমের জন্যে খান দুই তালপাতার হাত পাখা। একটা পেখো কিনবে বর্ষার জন্যে। এই তো পৌষমাসের বৃষ্টিতেও তার পোখোর দরকার ছিল। মাটির পুতুল দোকানে গিয়ে একটা মুখো কিনবে। মা কালীর মুখো।

দয়াবতীর মতে সাহসী ঠাকুর বলতে তো একজনই 'মা কালী।' প্রয়োজনে স্বামীর বুকে লাথি মেরে দাঁড়িয়ে নৃত্য করতেও অসুবিধে নেই তার। তাই জন্যে মা কালীকে ভালবাসে সে। মা কালীর মুখোটা কিনেও নেয় সে। ভিলিপি এখন কিনবে না। কিনবে সন্ধ্যার পরে তখন ভীড় যাবে কমে। দামটাও কম হতে পারে তাই একটু পরেই কিনবে। মা লক্ষ্মীর পট নিতে পারলে হোত সে ভাবে একবার। তারপর তার মনে হয়, 'না সে কিনবে না। মা লক্ষ্মী কানা একচোখো। যাকে দেয় অনেক দেয়। যাকে দেয়না সে কানা কড়িও দেয় না। তবে আর লক্ষ্মীকে ডাকাডাকি করেই লাভ কি। ডাকলেও তো সে দেবে না? দেবে কি?'

এরকম ভাবতে ভাবতেই একজন বললো 'বৌমা তুমি?'

দয়াবতী একটু সলজ্জ উত্তর দিলো 'হ্যাঁ একাই'।

—আর কে আছে?

—আমি একাই কাকাবাবু!

—তাহলে তুমি এইগুলো নাও তো। একটু রাখো। আমি আরো কিছু কিনে নিই। তুমি ঐ আটচালার কোণটায় একটু অপেক্ষা করো। একসঙ্গে যাবো।

—তুমি কখন যাবে?

—খুব তাড়া আছে কি তোমার?

—না, কি এমন তাড়া।

—তবে একসঙ্গেই যাবো।

দয়াবতীর সাহস হয়। নিধিনাথ কাকার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই লাগে তার। সরকারী চাকরী করে যে। অনেক টাকা আয় করে। সম্পর্কে নিধিনাথ দয়াবতীর খুড়শ্বশুর। নিজের না হলেও নিজের মতন। দয়াবতীর পাশেই ঘর তাদের।

নিধিনাথ এমনিতেই সৎ ও সজ্জন বলে পরিচিত। মৃদু কথা বলে। মাথা নীচু করে রাস্তা হাঁটে। কাউকে চড়িয়ে কোন কথা বলে না। কাউকে দু'টাকা দিয়ে সাহায্য না করুক অন্তত কারো ক্ষতি করবার চেষ্টা করে না সে। তাই নিধিনাথ সম্পর্কে গ্রামের লোকজনের ধারণা ভুল হয়ে যায়নি।

বনগ্রামের মেলায় কোন দুর্ঘটনা নেই বললে অন্যায় হবে। চুরি ছিনতাই ধাক্কাধাক্কি ওজন কম ইত্যাদি ইত্যাদির ঘটনা অনেকই ঘটে, সবতো সামাল দেওয়া কারুর পক্ষেই সহজ নয়; তাই এরই মধ্যে কমিটি সদা সতর্ক থাকে। নানা অভিযোগের মীমাংসা হয় পার্টি অপার্টির দলবাজীতে। সরকারী আর বিরোধী দলের চাপান উতোরে অনেক কিছুই নষ্ট হয় তবুও মিলমিশ করবার প্রচেষ্টা থাকে গ্রামবাসীদের।

দয়াবতী বললো—'তোমার কত দেরী হবে কাকা।'

নিধিনাথ বললো—'ঘণ্টাখানেক।'

দয়াবতী বললো—'অতক্ষণ দাঁড়ানো যায় কাকা। বরং আমিও ও দিকটা দেখে নিই। তারপর এখানে চলে আসব। তুমি থাকবে কিন্তু আমি সেজন্যেই দেরী করব। না হলে অন্য কারো সঙ্গে চলে যাব।' বড় সতর্ক আর মার্জিত করে নিধিনাথ বললো 'অন্য কারো সাথে যাওয়ার দরকার নেই বৌমা, আমরা একসঙ্গেই যাবো। আমি এখানেই দাঁড়াবো তুমি ঘুরে এসো।'

যেদিকে জিভ্ ফোঁড় নিয়ে নাচ হচ্ছে। দুলে-বাগ্দীরাই মূলত এই ফোঁড়ের মানত করে। মাছের কাঁটায় পাঁচটা জিভ্ ফুঁড়ে মজার খেলার সঙ্গে ঢাকের নাচ হচ্ছিল।

একটা অস্ত বড় বাণে তিনজন ছেলে জিভ ফুঁড়ে কেরামতি দেখাচ্ছিল। দয়াবতীর সঙ্গে প্রায় সহস্র নরনারী এই আশ্চর্য কেরামতি দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিল। যে ছেলেরা এই

রক্তক্ষয়ী খেলা দেখাচ্ছিল তার লালা ক্ষরণ দেখে অনেক বালকের ভয় লাগছিল। দয়াবতীকেও ভাল লাগছিল না।

ওদিকে বাঁশ বরাবর উঁচু চড়কের মসৃণ ঘূর্ণি থেকে সন্ন্যাসীরা বাতাসা ছড়াচ্ছিল আর সেই বাতাসা স্বয়ং ঈশ্বরের আশীর্বাদ মনে করে মানত করতে করতে লোকেরা বাতাসা কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে লাগলো। দয়াবতী এ বাতাসা কুড়াবার আগ্রহ দেখালো না। এই ভিড়ের মধ্যে কোনক্রমে এসেই যেন ভুল করেছে। এই ভীড়ের মধ্যে ভীড় যেন তাকে সামনে পিছনে পীড়ন করেছে বার বার। তাই সে ভীড় এড়িয়ে পালাবার চেষ্টা যখন করল তখন মাইকে ঘোষণা করা হোল 'ভীড়ের মধ্যে একটা ব্যাগ হারিয়েছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে তা ফেরৎ দিলে উপযুক্ত সম্মান সহ পুরস্কৃত হবে।'

তখন রাত্রি ন'টা।

বনগ্রামে জ্যোৎস্না প্রায় ডুবু ডুবু। ক' দিন আগে অমাবস্যা ফুরিয়েছে তাই ঘড়ি মেপে জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল আলোয় ভুবন যেন পুলকিত ছিল।

নিধিনাথের হাতে কাঁধের প্যাকেটগুলো একজনকে দিয়ে বললো 'তুই যা আমার যেতে দেরী হবে।' মাত্র কাঁধে ঝোলার ব্যাগটি রইলো। লোকটি চলে যেতেই 'কিছু জিলিপি কিনে নিয়ে ব্যাগটায় রাখলো।' তারপর বললো, 'চলো বৌমা। রাত হোল।'

দয়াবতী বললো 'মেলায় গেলে অমন রাত হয়, সময় মেপে আসা যায় নি।'

—বাঃ সুন্দর কথা বলেছো। সত্যিই সময় মেপে আসা তো যায় না। তবুও তো মাপ বুঝতে হবে। সীমা বুঝতে হবে বাবা।

দয়াবতী বলে, 'আমি সীমা জানিনে কাকাবাবু। আমি প্রয়োজন জানি। আমার প্রয়োজনে যা দরকার তা পেতে হবে, আমার দেওয়ার যা দরকার তা দিতে হবে। দেওয়ায় ঘাটতি হলে যা পাওয়ার তা তো পাব নি কাকু।'

—তুমি ঠিকই বলেছো দয়াবতী। জগতটা দেওয়া-নেওয়াতেই চলে। কিন্তু কার কাছ কি পাব কি দেবো এটা বোঝাই বড় কঠিন বাছা। ঠিক লোককে ঠিকভাবে পেলে দিতে তো কোন অসুবিধা হয় না, কিন্তু ঠিক লোক বুঝব কি করে বলতো?

দয়াবতী নিজের উপলব্ধি 'লোককে বুঝি চেনা যায়। চেনা যায় তাদের। যারা দেবার জন্যে ধরা দেয় তারা ধরা দেবার আগেই ধরা পড়ে। তাদের চোখে ধরা পড়বার জন্য আকুলি বিকুলি করে।'

জ্যোৎস্নায় হাঁটতে হাঁটতে তারা অনেকটা পথ চলে আসে। মূল রাস্তা ছেড়ে শাখা পার করে রেল লাইনের ধারে এসে হাজির হয়। তখন জ্যোৎস্না ডুবু ডুবু প্রায়। ঠিক সে সময় হুইসাল বাজিয়ে বনগ্রামে লাইন ঝাঁকিয়ে পেরিয়ে যাবার জন্যে ছুটে আসে। একটু দূরেই গাড়ীটা। আলো ফেলে দিয়ে দু'জনের দিকেই। সেই আলোয় দয়াবতী পার

হতে চাইলো রেল লাইন। খুব ঝাঁকুনি দিয়ে টেনে নিল নিধিনাথ। তৈরী ছিল না দয়াবতী। অতর্কিত আকর্ষণে হক্‌চকিয়ে নিধিনাথকে জড়িয়ে ধরলে সে। নিধিনাথ বললো 'বোকা মেয়ে, এখন পার হতে নেই। পার করে দিতে হয়। ও চলে গেলে পার হতে হয়।'

বুকটা টিপ্‌টিপ করছিল দয়াবতীর। সে তেমন করেই ধরে থাকলো নিধিনাথকে। মুহূর্তের মধ্যে রেল ঝম্‌ঝম্‌ করে জ্যোৎস্না রেখে আলো নিয়ে চলে গেল। বনগ্রামের এই ডুব জ্যোৎস্নার আলো আঁধারিতে নিধিনাথ দয়াবতীকে পরম প্রীতির মধ্যে জড়িয়ে ধরে রেললাইন পার হতে থাকলো। নিধিনাথ বললো 'দয়া'।

দয়াবতীর কথা বলার সাহস যেন হারালো। সে যেন কোন কথা বলতে পারলো না। দয়াবতী জানে এই উৎকণ্ঠার উজান বেয়ে যে বিপদ এসেছিল সেই বিপদের আশ্রয় তো নিধিনাথ। নিধিনাথকে সমর্পণ করে যে নিশ্চিন্ত বিশ্রামের ছোঁয়া পেলো সে কেউ কি তাকে এরকম আশ্রয় দিয়েছে।

দয়াবতী একে অবশ্য আশ্রয় বলতে রাজী নয়। তবে এই বিপদের মুহূর্তে একে আশ্রয় না বলেই বা কি বলা উচিত। দয়াবতী নিধিনাথের প্রতি কেমন দেহমনে দুর্বল হয়ে গেল। এবং নিধিনাথও সেই চাঁদের আলোয় বিকল হয়ে আরো গভীর মমতায় দয়াবতীকে আশ্রয় করলো যেন।

এরা এখন কেউ জানে না কে কার আশ্রয়। নিধিনাথের আশ্রয় দয়াবতী নাকি দয়াবতীর আশ্রয় নিধিনাথ। এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন সমস্ত করণীয় ভুলে গিয়ে বিপদের অনুকূলে যাত্রা শুরু করে ঠিক তেমনি করেই দয়াবতী নিধিনাথ মাঠে নেমে পাশের অন্ধকার বাগানের দিকে হেঁটে গেল। কে আগে টানলো দয়াবতী না নিধিনাথ এ বিচার কেউ বা করবে, কেনই বা করবে। এক আশ্চর্য অনুভূতি দুই উদ্দাম নরনারীকে গভীর খাদের দিকে অবিরাম খরস্রোতা নদীর মতো টেনে নিয়ে গেল তা অস্বীকার করবার উপায় মাত্র ছিল না।

চড়ক সংক্রান্তির রাতের আবহাওয়ায় সেই খর উত্তাপ নেই। মৃদু দখিনের স্নিগ্ধ বাতাস ছিল কিন্তু আলো আঁধারির ম্রিয়মান জ্যোৎস্নায় মুগ্ধ পরস্পর নিবেদন করলো পরস্পরের কাছে। সজ্জন ও সৎ নিধিনাথ এই নিরবচ্ছিন্ন দুর্বল প্রহারের আক্রমণে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে ছায়াঘন বন বাগানের মধ্যে নিঃশব্দে নিজেদের উজাড় করে দিল।

দয়াবতী বললো ঃ এবার?

নিধিনাথ বললো ঃ যেখানে যাবার সেখানে ফিরতে তো হবেই।

খানিক নিঃস্তব্ধ থেকে জিগ্যেস করলে, 'তুমি কি কিছু মনে করলে?'

—আমিও তো জিগ্যেস করতে পারি?

—যা শুরু হোল তা কি এখানেই শেষ হবে?

দয়াবতী একটু নীচু স্বরে বললো 'জানি নে।' তারপর হঠাৎ নিধিনাথের বুকের মাথা রেখে নিঃশ্বাস বিস্তার করে বললো 'না' নিধিনাথ এই কথায় আশ্চর্য হয়নি। বরং তার বহুকালের না বলা ইচ্ছেটা হঠাৎ কোন ঈশ্বরের অভিপ্রায়ে সত্য হয়ে গেছে, তা সে নিজেই জানে না। এই সত্যকে সে কেমন করে টিকিয়ে রাখবে সে কথাও সে ভাবেনি। সে কেবল দয়াবতীর শরীরময় শরীর জড়িয়ে তার প্রশস্ত ও ব্যগ্র হাত দু'টির অবিরাম দয়াবতীকে আবিষ্কার করতে থাকলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে বললো 'রাত হোল চলো।'

* * *

এই কথাটিই স্থির থাকলো না। অনিঃশেষ বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে গেল যে দয়াবতী খুড়শ্বশুরের সঙ্গে বাগানে মাতামাতি করেছে। কে দেখেছে কে শুনেছে কে সাক্ষী একথা প্রচার নয় তবে চড়কতলা থেকে ফলো করেছিল যে দু'তিনটে ছেলে, তারাই আদ্যোপান্ত নজর করেছে। সব ঘটেছে তাদের চোখের সামনে। মাদকতায় অন্ধ নিধিনাথ কিংবা দয়াবতী সেদিকে একতিল নজর দেয়নি। তারাই রাতে এসে প্রথমে ক্লাবে, তারপর পার্টি অফিসে, তারপর পাড়ায় হৈ হৈ করেছে।

নিধিনাথের বৌ বাসন্তী খুব সুন্দরী নয়। তাবলে সে খেঁদী-পেঁচীও নয়। বি. এ. পাশ করা হয়নি তার বিয়ের জন্য। পড়াশোনায় সে ভালই ছিল। নিধিনাথের ব্যবহারে সে কোনদিন অসন্তুষ্ট নয়। নিধিনাথের বিরুদ্ধে এসব কথায় বাসন্তীর মাথায় যেন বাজ পড়লো। যে কোন বুদ্ধিমতী স্ত্রী স্বামীর দুর্নাম সহ্য করতে পারে না। হতাশায় কখনো কখনো আত্মহত্যা পর্যন্ত হয়ে যায়। এসব কিছু না হলেও বাসন্তী প্রথমেই নিধিনাথকে ডেকে উপর ঘরের নিয়ে গেল। তারপর ঘটনা সম্পর্কে জানবার চেষ্টা করল নিধিনাথ।

নিধিনাথের যেন আত্মহত্যার সমান। আবেগ তাড়িত যন্ত্রণায় আলো আঁধারের ষড়যন্ত্রে মন্ত্রমুগ্ধের মতো অন্যায়ের কাছে অজান্তেই যেন নিধিনাথ নিজেকে বলি করে দিয়ে জীবনের প্রথম ও শেষ ক্ষতি করেছে। সে ভাবলো স্ত্রীকে সত্য না বললে প্রতারণা হয়। আবার সত্য বললে বলে দাম্পত্য সত্যভঙ্গ হয়। কি করবে সে।

বাসন্তী খুব সহজভাবে 'তোমার কাছে সত্যই প্রত্যাশা করি।' নিধিনাথ বললো, 'সত্য কি জানি না বাসন্তী। সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে আমিই সত্য, এবং তুমিও। এই মধ্যাহ্ন দুপুরে যে প্রশ্ন এসেছে এ প্রশ্নের উত্তর দিই কি করে?' বাসন্তী বললো, 'জীবন তো সহজ নয়। অনেক রক্তমূল্যে পরীক্ষা দিয়েই তবে জীবনকে পাওয়া যায়। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। কিন্তু তবুও যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে তাকে মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে বলো।' বলেই নিধিনাথের গলা জড়িয়ে মৃদু একটা চুমু খেলো।

প্রত্যুত্তরে নিধিনাথ তার হাত বিস্তার করলো।

বাসন্তী আবার বললো 'ঠিক কি ঘটেছিল। নিশ্চিন্তে বলো। আমাকে বিশ্বাস করো তুমি।'

নিধিনাথ বললো 'দয়াবতীর সঙ্গে চড়কতলায় দেখা হয়েছিল। সে আমার সঙ্গে এসেছিল। ব্যস। এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। এরপর যদি কোন কথা হয় সে কথা পথের কথাই বাসন্তী। সেখানে জীবন নেই।'

নিধিনাথ ভাবলো এই পর্যন্তই ভালো। দেখা যাক না কতটা সামলানো যায়। সে বাসন্তীকে আদর করে কোলে করে চাগিয়ে নিলো। তারপর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুড়সুড়ি দিতেই দিতেই হাসিতে লুটিয়ে পড়লো বাসন্তী।

সে দু'চোখ মুদে নিধিনাথকে তেমনি করে আদর করে বললো, 'আমার মানুষকে আমি চিনি না?'

ছাতিটা ধক্ করে উঠলো নিধিনাথের। সত্যিই বাসন্তী কি 'এই মানুষটাকে চেনে।' চেনে না। চিনবেই বা কেন? তাই সে আপাতত গোপনেই থাকলো নিধিনাথের সঙ্গে। একান্তে বাসন্তীকে বললো, 'বাসন্তী তুমি ঠিকই বলেছ, আমার মানুষকে আমি চিনি না?'

কথা চাউর হতেই হরিপদ রেগে খুন। তাকে দোকান চালায় কে যেন বলেছে 'তোর মাগকে নিয়ে কাল রাতে ফস্টিনষ্টি করেছে।' হরিপদ বিশ্বাস করেনি। সে চীৎকার করে বলে, 'কুন শালা বলেছে' দোকানে তো এই মারে এই মারে। যারা বক্তা তারাও রেগে খুন যারা শ্রোতা তারাও খুন। কারো সঙ্গে কোন তর্ক না করেই হরিপদ ঘরে যায়। টালির ঘরে দুয়ারে ভাত নামিয়ে তরকারি করছিল দয়াবতী। দয়াবতীর শরীরে এখন কিছু নেই। মাত্র একটা পুরানো শাড়ী পরে আছে তাও দু'একটা জায়গা ছেঁড়া। দয়াবতীর মুখে হাসি ছড়িয়ে আছে ফুলের মতো নয় আলোর মতো।

হরিপদ দয়াবতীকে একদিন বলেছিল 'তোর মুখটা আলোর মতো ফুলের মতো নয়।'

দয়াবতী হেসে বলেছিল, 'কেন? ফুলের মতোই তো ভাল? আলোর মতো বলছো কেন? ফুলের মতোই ভাল।'

হরিপদ বলতো 'ধূর খেপী ফুল তো শুকিয়ে যায়, তোর মুখ শুকোয় নি। তোর মুখটা আলোর মতো আলো নিভে যায় শুকোয় নি।'

হরিপদ পিছন থেকে দয়াবতীকে দেখে। তার বুক জোড়া আনন্দে যেন তুফান তুলেছে। স্তনের পাশের আঁচিলটায় তার চোখ পড়ে, কি মিষ্টি সে আঁচিল। হরিপদ প্রথম প্রথম কত প্রহর যে আঁচিলটা দেখেছে তা সে জানে না।

দয়াবতী বললো, 'কি গো ফিরে এলে যে, গরুর গা তো ধোয়াতে হবে।'

হরিপদ বলে, 'ধূর মাগী, আগে চল তোকে আগে গোবর ঘষে ধুয়ে শুদ্ধ কবি তারপর গরুর গা ধোয়াবো।'

দয়াবতী মুখ নেড়ে বলে 'ওঃ মদ্দর কত তেজ। একটু লড়বার মুরোদ নেই সে আমার গা ধোয়াবে। কেন কি হইচে।'

হরিপদ বলে 'কাল কি করেচু।'

দয়াবতী একটু ঘাবড়ে যায়, 'কেন কি করেছি।'

—'কাল কি কোন ঘটনা ঘটেছে?'

বিরক্ত হয়ে বলে, 'আরে কি বলছ তা যদি না বলো তবে বুঝব কি করে?'

মুখখিস্তী করে হরিপদ বলে, 'ন্যাকা মাগী কি বলছি বুঝতে পারুনি। আজ তোর একদিন কি আমার একদিন' বলেই সামনে দাঁড় করানো সাপ মারা লাঠিটা নিয়ে তেড়ে যায় দয়াবতীর দিকে।

হরিপদকে জানা আছে দয়াবতীর। সেও উনুনে যে বাঁশ ফালিগুলো জ্বলছিল তারই একটা আগুন সহ নিয়ে তেড়ে যায় হরিপদর দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে যায় একটা খুটো ঠেস দিয়ে। দরদর বেগে জল পড়তে থাকে তার চোখে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'ওলাওঠোরা আমাকেই দোষ দেয়, আমাকেই দেখে রেখেছে। এই ছেঁড়া কাপড় পরে অতি কষ্টে সংসার চালাই, কুনু গুর বেটা তো পাঁচ পয়সা দিয়ে সাহায্য করেনি, তোমার মতো পাঁঠার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গোটা জীবন জ্বলে পুড়ে মরে গেলুম।' আরো কত কি বলে কাঁদতে থাকলো।

হরিপদ কি সত্যিই দেখে সংসার। সংসারের সব আঁটিকুটি সব কিছু হাড় মাস অভাব অনটন সবকিছুই তো দয়াবতীই দেখে। ভিক্ষে বল সাহায্য বল ধার বলো দেনা বলো সবই তো তাকেই দেখতে হয়। হরিপদ তো কিছুই দেখেনি। তাহলে কোথাও কোন ঘটনা ঘটলে দয়াবতী দায়ী হবে কেন? যদি কোন ঘটনা ঘটেও সেক্ষেত্রে হরিপদ গেলে সেরকম ঘটনা তো ঘটবার কথা নয়।

দয়াবতী কাঁদে, 'তোমার জন্যে আমাকে লোকে গালমন্দ করে। সাহস পায়। তুমি যদি তেমন হতে একথা শুনতুম কেন?' অনুধাবন করে কথাগুলো। তারপর লাঠিটা যেখানে ছিল সেখানে দাঁড় করিয়ে রাখে। উঠে আসে দাওয়ায়। বৌ-এর হাতের বাঁশ ফালিটা কেড়ে নিয়ে উনুনে গুঁজে দেয়। তারপর তাকে টেনে নিয়ে বলে 'অমনভাবে বলা আমার ভুল হয়ে গেছে। উঃ শালারা আমার মাথা খারাপ করে দিল।'

—'তোমার সুন্দরী বউ দেখে ওদের মাথা খারাপ হলে আমি কি ওদের মতো হয়ে যাব?' পাল্টা জিগ্যেস করে দয়াবতী।

হরিপদ 'ছাড় শালাদের কথা। শালাদের মুখে মুতে দে। যে শালা বাজে কথা আমার বউ-এর নামে বলবে তারে জুতোয় মুখ ভেঙ্গে দেবো।'

দু'চার জন উৎসাহী হরিপদর পিছু এসেছিল নাটক দেখার জন্যে তারা যখন দেখলো যে হরিপদ নাটকের দলে নেই, তারা একটু বেশী বিরক্তই হোল। বিশেষত 'মুতে দোব'

এই কথায় রাগে বিব্রত হয়ে জিগ্যেস করলো 'হরিপদ মুখ সামলে কথা বলিস।' হরিপদ তাদের দিকে তেড়ে গিয়ে বললো, 'এই শালা, তোদের খাই নাকি যে মুখ সামলে কথা বলব। শালা আমার ভিটেয় যদি উঠবি, তো ফের ঘাড় ঘুরিয়ে দোব।'

তাদের একজন বললো, 'আমাদের মুততেও লাগবেনিরে শুয়োরের বাচ্চা, তোর দরকার হোল বলে।'

—'যা না শালা, তোর বাপকে বলগে যা; এখুনি গাই এনে হাতে ধরবে পনর টাকায় করে দে ভাই।'

হরিপদকে ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখে তারা চলে গেল শাসাতে শাসাতে তারপর খানিক পরে দয়াবতী উনুনে জ্বাল দিতে দিতে বললো, 'আমাদের কেউ ভাল দেখতে পারলো নি। কেউ না।'

হরিপদ বললো 'চান করে এসি। ভাত বাড়' বলেই সে বেরিয়ে গেল।

কথাটা যখন থেকে চাউর হয়েছিল তখন দয়াবতীও জেনেছিল। তার ছাতিও টিপ্‌টিপ করছিল। কি হয় কি হয়।

দয়াবতী জানে 'ঘরের মানুষ' ঠিক থাকলে পরের মানুষ তার কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু নিধিনাথ কি তাকে অস্বীকার করবে! লোকে বলে দয়াবতী তিন ছেলের মা। অমুক লোক অতগুলোর ছেলের বাপ। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে মা সমস্ত ব্যথাকে সহ্য করবে। একথায় দয়াবতীর মনে প্রশ্ন জাগে 'ব্যথা কি শুধু মেয়েদের জন্য। তিন ছেলের মা যদি সহ্য করতে পারে তিন ছেলের বাবা বা সহ্য করবে না কেন?' মেয়েদের উপর কেবলমাত্র অত্যাচার ঝুলানোর বিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চায় দয়াবতী। কিন্তু পারে কই। সে যে বড় একা। তার দাবীর কাছে সে নিজেও যে সোচ্চার হতে পারে না। তাই ঐক্যবদ্ধ হবে কি করে।

তার মনেপ্রাণে আনন্দ জেগে উঠেছে। পুলকিত হয়েছে তার তবু মন। শরীরের ভিতর পর্যন্ত যেন পুলকে কাঁটা দিয়ে উঠেছে নিধিনাথের জন্য। 'লোকটা কত মিষ্টি। কত সুন্দর। হায় হরিপদ তুমি তার তুলনায় কীটেরও অধম ছাড়া আর কি?' স্বামীকে দেবতা বানিয়ে এরকম হতচ্ছাড়া গর্দভকে পরজন্মে প্রার্থনা করার মতো মূর্খতা দেখাতে পছন্দ করে না দয়াবতী। দয়াবতী প্রতিজ্ঞা করে 'আমি থাকব। আমি একশ বার থাকব নিধিনাথের সঙ্গে। অবৈধ হয়েই থাকব। সে যদি প্রত্যাখ্যান না করে।'

বড় ব্যস্ত হয়ে নিধি এসে হাজির হয় হরিপদর ঘরে। হরিপদ তার ভাইপো। প্রতিবেশী ভাইপো। নিধিনাথকে হরিপদ যথেষ্ট সমীহ করে। বয়সে প্রায় সমান বয়েসী হলেও খুড়ো-ভাইপোর সম্পর্কে কোন নৈতিক স্খলনের ঘটনা ঘটেনি হরিপদর সঙ্গে। এখনো রান্না হচ্ছে দেখে নিধিনাথ দয়াবতীকে জিগ্যেস করে, 'এত বেলা হোল যে বৌমা।'

লজ্জা পেলো দয়াবতী। 'তুমি না এলে রান্না হবে নি গো কাকা।'

নিধিনাথ দয়াবতীর কথায় জাল দেখতে পায়। যেন জালে পড়ে গেছে সে।

নিধিনাথ বলে 'ঠিকই বলেছ। তুমি এত সুন্দর কথা বলো বৌমা। ঠিকই বলেছ। রান্না করে নাও। এই টাকা ক'টা রাখো।'

—কিসের টাকা কাকা।

—তোমার লাগবে বৌমা। তুমি রাখ। এবার থেকে আমার প্রসন্নতা পাবে তুমি।

—'কাকা।' মৃদু উচ্চারণ করে কেঁদে ফেলে।

নিধিনাথ বলে, 'জীবন তো এরকমই বউমা। দুঃখ করবার যেমন কিছু নেই, ভয় পাবার তেমন কিছু নেই।'

—'কিন্তু—' দয়াবতী আটকায়।

নিধিনাথ বলে, 'এই কিন্তু মুছে ফেল বৌমা। যে কথা চাউর হয়েছে সে কথা যারা বলছে তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে থামিয়ে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে। ওকথা বলতে নেই।'

—তাহলে?

—সত্যকে বলতে হয় সত্যের মতো। পবিত্র করে। আগে ঠেকাও ওদের, পরে বিবেচনা হবে।

দয়াবতী গুনে দেখলো 'পাঁচশো টাকা আছে।' মনে মনে ভাবলো 'কত টাকা'। একসঙ্গে এত টাকা তো দেখেনি সে। টাকা নিতে একদম রাজী নয় সে। তবুও জোর করে রেখে দেয় দয়াবতীর জন্যে।

—'ঠেকাতে তো দোষ নেই কাকা, ঠকাবে না তো?' উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিগ্যেস করে দয়াবতী।

নিধিনাথ বললো 'না, অসম্ভব।'

* * *

সন্ধ্যায় তখন হয়ে গেছে একটু আগেই। দিনের সূর্য্যি অনেকটা ঢেঙা হয়ে যাওয়ায় রাত্রি একটু বেঁটে হয়ে গেছে। তাই সন্ধ্যাকেই রাত বলে মনে হয়।

সতীশ মাষ্টার উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'বৌদি'।

—কে গো বাবা।

—'আমি সতীশ ঠাকুরপো।'

—'ঠাকুরপো'?

—'বসো আসছি, একটু খড় দিয়ে নিই ষাঁড়টাকে।'

—খানিক পরে লণ্ঠনে দড়ি বেঁধে সেই আলো নিয়ে গোয়াল থেকে এলো দয়াবতী।

—'কি ব্যাপার গো? আমার ঘর তাহলে হলনি।' দয়াবতী জিগ্যেস করলো।

—'হবে হবে।' সতীশ ঠাকুরপো বললো। 'একটু জল খাওয়াও দিকি।'

আগ্রহের সঙ্গে বললো দয়াবতী. 'দিচ্ছি।' সবাই সব পেলো আমি কিন্তু কিছু পেলুম নি। ক' কিলো গম-চাল দিলে অভাব ঘুচে নি ঠাকুরপো। একটু ঘরদোরও দরকার।

—হবে হবে। এত আঁকপাক কেন? থামো না আছি আছি।

—আরে বাবা সরকারটাতো যায়নি এখনো। এখনো থাকবো আমরা।'

—তা থাকোনা তোমরা, একটু দেখো আমাকে। তোমার দাদা যে কিছুই পারলো নি।

—'বসো দাওয়ায়। দেখি জল আনি।' দয়াবতী বললো।

—বৌদি একটা কথা জিগ্যেস করি?

—বলো।

- গতকালের ঘটনা কি ঠিক?

—কি ঘটনা?

—তোমার সম্পর্কে?

—যারা বলছে তারা কি বেঠিক বলবে। লোকে কি মিছামিছি বলে?

—না তা বলে না।

—দাঁড়াও জলটা আনি। বলেই ঘরে ঢুকে গেল দয়াবতী।

দয়াবতীর মেয়েরা দুয়ারেই ছিল তারা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে। একজন বললো 'মা ঘুম ধরেছে, খাব।'

দয়াবতী বললো, 'বোস কাকুকে জল দিই, খেতে দেবো।'

ঘরের মধ্যে ঢুকে সে একটা গেলাসে জল গড়াতে লাগলো। পিছু পিছু ঘর ঢুকলো সতীশমাস্টার।

ঘরের মেঝের চারদিকে তাকিয়ে দেখলো পিতলের বাসনকোসন বলতে কিছু নেই। নোংরা ময়লা কয়েকটা কানা ধোকড়া, ছেঁড়া মাদুর দু'টো। টিনের কলাই করা বাসন গোটা কতক। পানের ডাবর একটা চোখে পড়ল তার। দয়াবতী জলের গেলাস নিয়ে ধরলো সতীশ ঠাকুরের দিকে। সে গেলাস হাতে না নিয়ে দয়াবতীর গায়ে হাত চালিয়ে দিল। মৃদু হেসে দয়াবতী বললো 'ভাল নাও ঠাকুরপো' বাঁ হাত বাড়িয়ে জলের গেলাস নিল বটে কিন্তু ডান হাত দয়াবতীর শরীর থেকে সরালো না। ইচ্ছে করেই দয়াবতী বাধা দিল না তাকে। সিঁথির সিঁদুরটা কুটকুট করছিল বলে ডান হাতে করে সিঁদুরটা চুলকে নিয়ে ডান হাতের কব্জি ধরেই হাসতে হাসতে বললো 'এই কি হচ্ছে। থামো।'

'সতীশ ঠাকুরপো' অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার গলার স্বরে এলো প্রচ্ছন্ন কাঁপুনি। তারপর নিজেকে সংযত করে দুয়ারে এসে বললো, 'আজ মিটিং আছে তোমাকে জুটতে হবে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে এসো। আটচালায় বসা হবে।'

—কি মিটিং?

—তোমাকে নিয়েই মিটিং, কিছুই হবে না। আমি আছি। চিন্তা করবার কারণ নেই। এসো।

দয়াবতী মনে মনে গাল দিলো, 'শুয়োরের বাচ্চা, তোমরা আমার মিটিং করবে অথচ আমার শরীরকেই ঘণ্টঘাঁটা করবে। ঠিক আছে। সে বললো 'যাবো।'

বনগ্রামের রেল পার পেরিয়ে যে চড়কতলা তারই গা ঘেঁসে কোন আদি কাল থেকে ঠাকুরের সংস্কৃতির আয়োজন তা গাঁয়ের মুখ্যু মুখ্যু লোকেরা তা জানে না। জানার দরকার নেই তাদের। কিন্তু গত ক' বছরের প্রয়োজনে রেল পারের এপারেও গড়ে উঠেছে ফিডিং সেন্টারের চালা, কালী মন্দিরের চাতাল, প্রাইমারী স্কুলঘর। গ্রাম তার গ্রামের প্রয়োজনেই এই অঞ্চলকেও গড়ে ফেলেছে।

বনগ্রামের এই নতুন কালী মন্দিরের আটচালায় এপারের ঝক্কি ঝঞ্ঝাটগুলোর আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসা করা হয়। অধিকাংশ ব্যাপারেই বনগ্রামের লোকেরা থানা-কোর্ট-আইন-আদালত করে না। প্রায় সব নিজেরাই মাথা ঠাণ্ডা করে মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ফলে গাঁয়ে বর্ষীয়ান মুহুরী প্রায়ই বলে 'তোরা একটা কাজের জোগাড় করে দে আর পেট চলবেনি মুহুরীগিরি করে।

পঞ্চায়েত চালায় সরকারী দল। বিরোধীদলের অস্তিত্ব সারা বছরই থাকে না। সেই ভোটের সময়। ফলে একতরফা রাজনীতির পতাকা উড়িয়ে সরকারী দলের সাহস বেড়ে যায়। যেহেতু বিরোধিতার লেশমাত্র নেই, তাই শাসক দল ভয় করবেই বা কাকে। তাই সে বরং উলটে ভয় দেখায় বিরোধীদের। এর ফলেই আলোর পেটে যেমন কালির জন্ম হয়, তেমনি করেই শাসকের এই একতরফা কাজের মধ্যে গ্রামীণ অনুশাসনে ফাঁক থাকে। তা স্পষ্ট করে চিহ্নিত হয়।

ফিডিং সেন্টারের পাশেই কালী আটচালা। কালী আটচালায় বেশ সুন্দর করে মাদুর-ত্রিপল পেতে দেওয়া হয়েছে। তারই মধ্যে লোকজন জুটেছে অন্তত শ'খানেকের বেশী। কালী আটচালায় যেন তিল ধারণের জায়গা নেই।

নানান বয়েসের ছেলেরা এসেছে। ফাইভ-সিক্সের ছেলেরাও এসে হাজির হয়েছে এখানে। তারা শুনবে মিটিঙে কি হয়। আঠারো-কুড়ি বছরের ছেলেগুলো দারুণভাবে লাফাচ্ছে। যেন আজ দয়াবতীকে ড্যাং করে কেটে ফেলবে তারা। কোন দুর্বলতাই তারা দেখাবে না। আঠারো-কুড়ি বছর বয়েসের প্রায় সব ছেলেমেয়েরাই নৈতিকতার ঊর্দ্ধে কাজ করে। এসময়ে তারা স্বার্থপর হয় না, কুটিল-জটিল হয় না। সহজভাবে সরলতাকেই পাত্তা দেয় তারা। রাজনীতির কূটচালে তারা বলি হয়, তারা মরে তারা মারেও। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের বিক্ষত হতে হয় না বলেই কোন অভিজ্ঞতা থাকে না। এবং এই

অনভিজ্ঞতার কারণেই বুদ্ধিমান লোকেরা এদের সাদা কাগজের মতো চুজ্ করে এবং যেমনটি রেখাচিত্র এঁদের মনে আঁকে ঠিক তেমনিটিই অঙ্কিত হয়। কিছু করবার থাকে না। ফলে উত্তেজিত হয় এরা বেশী। একটু বেশীই বিব্রত করে সবাইকে। ফলে আটচালায় এই বয়েসের ছেলেমেয়েরাই ছিল উত্তেজিত।

পয়লা বোশেখের ভোর থেকেই কথাটা চাউর হচ্ছিল। এবং দ্রুতগতিতেই কথাগুলো পাক খাচ্ছিল কানে কানে। প্রকাশ্যে এসেছিল বেশ ভাল করেই। বনগ্রামে পয়লা বোশেখে দোকান পূজার উৎসব হয় না। এখানে অক্ষয় তৃতীয়ায় পুজো হয়। রেল পারের বাজারে বিশ-পঁচিশটা দোকান আছে, সেই দোকানগুলোর অক্ষয় তৃতীয়াই নতুন ব্যবসার সঞ্চার করে। যেহেতু চৈত্রী মাসের ধার-হাওলাত মিটিয়ে পয়লা বোশেখ গ্রামবাসীদের একটু বেশী অসুবিধায় ভুগতে হয় তাই বৈশাখের। অক্ষয় তৃতীয়াই এরা বেশী পছন্দ করে। সেজন্যে পয়লা বোশেখে খুব বেশী ঝক্কিঝঞ্ঝাট থাকেনি এদের। যাদের আছেও বা তারা একটু বেশী উৎসাহী হয়ে ফিরে এসেছে।

কথাটি চাউর হয়েছিল যে আজ দয়াবতীর বিচার হবে। সন্ধ্যাতেই বসা হবে। কিন্তু রাত একটু বেড়েই গেছে ফলে এখনো বিচার শুরু করা যায়নি। পয়লা বোশেখের দিনে যাদের কাজ নেই তারা তো সন্ধ্যে থেকেই মজা করবার জন্যে এসে হাজির। যারা ব্যস্ত তারা দ্রুত কাজ সেরে নিয়ে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে। তাদের অনেকেরই বক্তব্য আজ ভাই দয়াবতীর বিচার হবে, 'ডাক আছে যাই। তাড়াতাড়ি যাই।'

কেউ এমনও প্রশ্ন করেছে, 'দয়াবতীর বিচার?'

হেসে মন্তব্য করেছে ঃ মাঝবয়েসী বুড়ো-বুড়ীর কেলেঙ্কারীর বিচার। শালাদের জুতো মারব, যাই।

অবাক জিজ্ঞাসা এসেছে ঃ 'ইস্ ছিঃ ছিঃ মাঝবয়েসী লোকজন যদি এরকম করে তবে কমবয়সী ছেলেমেয়েরা কি করবে?' জ্ঞানীর মতো নিজেই উত্তর দিয়েছে ঃ শক্ত হাতে মোকাবিলা করা উচিত। একদম বাড়তে দেওয়া যাবে না এই প্রবণতা।

যিনি আবার ছুক্‌ছুকে প্রবৃত্তির তার মনে হয়েছে 'মেয়েটা বোকা লোকের সঙ্গে ফাঁসল। আমিও তো যোগাযোগ করতে পারি।' দয়াবতীকে যারা আকাঙ্খা করতো তার অপরূপ রূপের জন্য তারা যে এবার থেকে সাহস পেলো সরাসরি 'এ্যাপ্রোচ' করবে।

রাত ন'টা প্রায় কিছুক্ষণ আগেই ফুরিয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার লাবণ্য আজ মাখা আছে চরাচর জুড়ে। উঠোনে নামতেই দয়াবতী নিজেকে যেন সাহসিনী মনে করল। মেয়েদের ঘরে শুইয়ে দিয়ে বললো 'তোরা ঘুমো আমি আসছি।' সে জেনেছিল 'মেয়ে ঘুমিয়ে গেল, তারা একটু দেরীতে এলেও দোষ হবে না।'

দয়াবতী বনগ্রামের পরিচিতদের কাছে নানা সম্পর্ক নিয়ে পরিচিতা হয়েছে

ইতিমধ্যেই। কেউ তাকে ঠাকুমা-বৌদি-কাকী-মাসী-দিদি-ভাই-এরকম কত ডাকে সম্বোধন করে তাকে। কালীতলায় লোক জুটেছিল যারা তারাই বললো 'রাত হোল শুরু করতে হবে।' বিনয় মাষ্টার বললো 'কি আশ্চর্য দেখো, আমরা যখন অন্যান্য মিটিঙ ডাকি তখন এত লোক নেই, আজ দেখো লোক যেন পালায় না। লোক থাকে। দেশের হল কি?'

বিনয় মাষ্টার একটা জুনিয়র ইস্কুলের শিক্ষক। বনগ্রামের গ্রাম কমিটির সম্পাদক। সরকার নির্বাচনের পরেও তার প্রতিনিধির বাইরে জনসাধারণকে কাজ করবার জন্য এই কমিটির জন্ম দিয়েছেন। যেহেতু জুনিয়র স্কুলের তেমন কোন দায় নেই দায়িত্ব নেই। পাবলিকের কাছে জবাবদিহি করতে হয় না তাই বিনয় মাষ্টারও গ্রাম সম্পাদকের কাজ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশেষত মাষ্টার একবার হলে আর পড়বার দরকার নেই। সেই আদ্যিকালের ধারণার উপর গয়ংগচ্ছ ভাব নিয়ে হচ্ছে হবে ধারণায় দিনগত পাপক্ষয় করায় অভ্যস্ত মাষ্টাররা পেশাকে 'দায়িত্ব এবং প্রাথমিক দায়' বলে অধিকাংশই মনে করেন না। ফলে পেশার জায়গায় পাষণ্ড হয়ে জগতের কল্যাণের কাজে লেগে পড়েন। আর্থিক সুবিধা থাক বা না থাক ছড়ি ঘোরানো যাদের 'বাঈ' তারা যায় কোথায়, তারাতো ঘোরাবেই।

ইতিমধ্যে আরো নেতাস্থানীয় গ্রামবাসীরা এসেছেন।

রবিবাবু সমবায় সমিতির সম্পাদক, থানা কমিটির গণেশ নন্দী, বৃদ্ধ কানাই মণ্ডল, মোড়ল তারাদাস রায়, সতীশ মাষ্টার, মহিলা সমিতি করেন রানু মিশ্র এরা সবাই এসেছে। এবং কালী আটচালায় আসন পেতে বসেছে। রানু মিশ্রকে সবাই 'রানুদি' বলে ডাকে। সে বললে, 'রাত হোল ওদের ডাকবার ব্যবস্থা করুন। বাড়ী ফিরবো কখন।'

সতীশ মাষ্টার বললে, 'আমরা আছি আপনাকে বাড়ী ফিরিয়ে দিতে পারব না?'

রানু বললে 'আরে দিতে যেতে হবে না ভাই। দিনকাল খারাপ, রাতেই তো ফেঁসে গেল দয়াবতী।'

রবিবাবু বললে 'তা অবিশ্যি'।

উৎসাহীদের ভেতর থেকে বললো 'দয়াবতী আসছে।' সে আসছে দেখেই অনেক ছোট ছেলেও মন্তব্য করল 'হবে নাকি।' কথাটায় উত্তর দেবার দরকার নেই মনে করে দয়াবতী কিছু মন্তব্য করল না। একজন অপরিচিত যুবক দয়াবতীর কানের কাছে যেয়ে বললো, 'আপনি দারুণ, আমি আপনার ঘরে যোগাযোগ করব।' চোখ নামিয়ে নিল দয়াবতী। ভেতর থেকে এমন সব টিপ্পনী এলো যা শুধু অশ্রাব্যই নয়, কটূও। দয়াবতী কোন কটূ আচরণ করেছে কিনা সে জানে না, কিন্তু দয়াবতীর আচরণকে ঘিরে যে দস্যিপনা শুরু হয়েছে তা কেবল কটূ বা অশালীন নয় বরং বড় বেশী ঘৃণার।

তিন সন্তানের জননী এবং পঁয়ত্রিশ-ঊর্দ্ধ এই রূপবতী বউকে যারা হেনস্থা করছে তারা নিতান্তই কমবয়েসী, কমবয়েসী ছেলে। মেয়েরা তেমন কোন হাজির হয়নি। দয়াবতীর চেয়ে বড় যারা আছেন কিংবা সমবয়সী হলেও দয়াবতীর বলার কিছু ছিল না।'

কে যেন একজন বললো 'বছরের প্রথম দিনে এমন ঘটনার জন্যে হাজির হয়েছি শুনে সূয্যিদেব আজ যে পাটে বসেছে, কাল থেকে আর সেই সূয্যি উঠবে না।

দয়াবতী যেন পাথর হয়ে আছে। মৌনী। মুখর না। যেন নত হয়ে গেছে সজীব শিরীশ পাতা। যেন নতমুখী হয়ে আছে লজ্জাবতী। দয়াবতীর প্রকৃতি লজ্জানত হলেও আজ একটু বেশী লজ্জানত।

দয়াবতী ফের ভাবছিল 'কারুর তো আমি অন্যায় করিনি, কারুর পাকা ধানে মই দিয়ে ক্ষতি করিনি তবে কেন আমাকে হেনস্তা করা হচ্ছে।

বৃদ্ধ কানাইবাবু বললেন, 'সব এসেছে তো এবার শুরু করো।' প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই কানাইবাবু বললেন 'রাত করে কী লাভ। শেষ করতে হবে তো?'

একজন বললে 'নায়ক তো আসেনি।'

'নিধিনাথ কি আসেনি।' জিগ্যেস করলেন কানাইবাবু।

নিধিনাথ অবশ্য তার দলের দু'চার জনকে নিয়ে আসবার তালে ছিল। গ্রামীণ রাজনীতির বিরোধিতা করাই তার স্বভাব। এমনিতেই নিধিনাথকে অসমৃণ বলে কেউ বলে না, কিন্তু সে বিরোধী শিবিরের বলে শাসকদলের লোকেরা তাকে বুদ্ধু বানাবার চেষ্টা করে।

নিধিনাথ বোকা বনে যাবার লোক নন, বোকা বানাতেও সে রাজী। সে যেমন কাউকে অহেতুক হেনস্থা করেনি তেমনি করে হেনস্তা হতে রাজী নয় সে। তার কথা হোল 'তোমার বাপের খাইনি হে, যে তুমি আমাকে হেনস্তা করবে।' এমনই দৃঢ় এমনই উজ্জ্বল নিধিনাথ।

ভীড়ের মধ্যে ফিস্ ফিস্ শব্দ হোল নিধিবাবু আসছেন।

একটা পরিচ্ছন্ন লুঙ্গী আর হাতাওয়ালা পাঞ্জাবী পরে আসছেন নিধিনাথ।

কমবয়েসী ছোক্‌রা একজন মন্তব্য করলে 'নায়ক এসেছে রে।'

'মার শালাকে গোবর ছুঁড়ে।'

নিধিনাথের হঠাৎ মনে হোলো, 'হাতী পাঁকে পড়লে, চামচিকেও লাথি মারে।' সে মনে মনে বললে, 'তোদের মতো ফালতুদের কখনই দরকার নেই আমার। বরং তোরা আমার পায়ে গড়াবি। মনে রাখবি।' ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেও তার রাগ সে সামনে নিল। বরং সে যেভাবে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তাকায় সে তেমন করেই ওদের দিকে তাকাল। কেউ রা কর'ল না।

বিনয় মাষ্টার বললো, 'এসো নিধিনাথ, এসো। হোলো।' তারপর নিজেরা কি একটা আলোচনা করে নিয়ে বললো কানাইবাবু আপনি সভাপতি হয়ে যান। আপনাকে সভা চালাতে হবে। কানাইবাবু লোকটা চাষী লোক। একটু বর্ধিষ্ণু চাষী। কিন্তু তিনি নিরপেক্ষ বলে গ্রামবাসীরা তাকে যথেষ্ট সমীহ করে। তিনি বললেন, 'সভাপতি হতে তো আপত্তি নেই, সবাই সাহায্য করলে সভাপতি নাহলে কি আর সভাপতি।'

গ্রামবাসীদের সবাই 'হ্যাঁ' 'হ্যাঁ' করতেই তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে সভা তো হবেই কিন্তু এখানে তো বাচ্চা ছেলেদের দেখছি, বাচ্চা ছেলেরা ঘর যাও। তোমরা এখানে কেন?'

একজন বললে 'কানাই জ্যেঠুর কাছে তো আমরা সবই বাচ্চা। আমিও কি চলে যাব।'

কানাইবাবু বললেন 'না তা বলছি না। যারা অন্তত ষোল আঠার বছরের কমবয়েসী তারা যাও।'

বয়স্ক লোকেরা খুশী হলো, 'আপনি ঠিকই বলেছেন।' সভা জুড়ে শব্দ উচ্চারণ হোলো 'যাও যাও, তোমরা যাও।' কিছু ছেলে গেল বটে কিন্তু সভা যেন জমাট হয়ে গেল।

সন্ধ্যা ক্রমশ মধ্যরাতের দিকে গড়াতে চলেছে কানাইবাবু জিগ্যেস করলেন, ' কী ব্যাপারটা বলতো গো? কে ডেকেছো সভা।'

বিনয় মাষ্টার বললো, 'নিধিনাথকে জিগ্যেস করুন কি ঘটনা ঘটেছে সেটা সে বলুক। এত উত্তেজনা তো ভাল নয়। তাই যাতে কোন অন্য ঘটনা না ঘটে সেজন্যে তৎপর হয়ে সমস্যাটার সমাধান করতে চাই।'

নিধিনাথ বললো, 'কে অভিযোগকারী, কি অভিযোগ, কেন ডাক এসব না বুঝেই আমি কি বলব। আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

বিনয় মাষ্টারের মুখটা একটু পাতলা। তার দলের লোকের সংখ্যাই এখানে বেশী। সে মুখ খামটা দিয়ে বললো, 'তুমি কিন্তু বোঝ না এরকম বলছ কেন? যা জান তা বলতে আপত্তি কোথায়?'

নিধিনাথ মাথা ঠাণ্ডা করেই বললো, 'আপনাদের হাতে প্রচুর লোক। ভাত ছড়ালে কাকের দুঃখু নেই। তা দিয়ে বিপরীত জনকে হেনস্থা করা খুবই সহজ কিন্তু কি অভিযোগ সেটা না জানলে কি বলব।'

কানাইবাবু বললেন, 'নিধিনাথ ঠিকই বলছে। ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ তো শোনাও।'

বিনয় মাষ্টার একটা ছেলেকে ইঙ্গিত করতেই সে তার বিরুদ্ধে রগরগে আদিরসের অভিযোগ আনলো।

নিধিনাথ বললো, 'কানাই কাকা ওর অভিযোগের প্রমাণ আছে?'

ছেলেটি বললো—'প্রমাণ আবার কি, আমরা তিনজনে দেখেছি।'

—ব্যস্‌ এইটুকু। আমিও দেখেছি অনেক।

—'ও কথা ছাড়। সে সব কথার হিসেব তো হয়নি। তবে আর তোমার দেখার হিসেব কে নিচ্ছে। ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে তোমাকে স্বীকার করতে বলা হয়েছে তুমি স্বীকার করো। ঝামেলা মিটে যাবে। গলায় একটু দরদী স্বর ছড়িয়ে বললো, নানা বাকবিতণ্ডার চেয়ে নিধিনাথ, ল্যাটা চুকিয়ে দেওয়া ভাল মেনে নাও।'

নিধিনাথের রাগ হোল প্রচণ্ড। সে বলবার চেষ্টা করল তাকে তারা অহেতুক হেরাস করছে। সে সরকারী কর্মচারী, এবং বিরোধী রাজনীতির সমর্থক তাই তাকে পেষণ করা হচ্ছে। সে বিরক্ত হয়ে বললো, 'আমি যার জামা নোংরা করেছি, সেটা তার আর আমার ব্যাপার যদি সে অভিযোগ করত বা তার স্বজন অভিযোগ করতো তাহলেও বা হোত, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ যার সঙ্গে কোন জামার সম্পর্ক নেই. তার অভিযোগ বলেই তোমাদের কথার বিরোধিতা করছি।'

গ্রামবাসীদের তরফ থেকে একটা উত্তেজনা দেখা দিল, 'মার শালার ঘাড়ে লাথি। ভদ্রলোক আবার কথা ঘুরাচ্ছে দেখ। জামা নোংরা করা ফষ্টিনষ্টি করা এক হোল।'

বিচারের কথাবার্ত্তা এমনভাবেই চলছিল, এমন সময় কে একজন এসে তার ঘাড় বরাবর একটা জোর থাপ্পড় বসালো, 'শালা সতীর বেটা সতী। বল শালা' বলেই আর একটা জোর থাপ্পড় মারল। তাকে সামলাবার জন্য আরো জনা দশেক লোক হস্তক্ষেপ করে কেউ সমালোচনা করল কেউ বিরক্ত হোল। সভাপতি বললেন 'এমন করে চললে তো সভা চালানো যাবে নি। বরং সভা বন্ধ করে দিতে হবে। এসবের নিন্দা করা দরকার।' কেউ কেউ ধাঁধালো তাকে তার হটকারিতার জন্যে। সে বীরত্ব দেখিয়ে বললে, 'আমাদের লজ্জা হচ্ছে, ওর লজ্জা হচ্ছে না। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, ছোটরা কি শিখবে আমাদের কাছ থেকে?'

নিধিনাথ ঘাবড়ে গেল খানিকটা। জীবনে কোথাও সে এতখানি লাঞ্ছিত হয়নি। কাল যে ঘটনা ঘটেছে সে ঘটনার জন্যে তার কোন শয়তানি ছিল না। পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। আয়োজনও ছিল না বরং বলা যেতে পারে সময়ের বিক্ষেপ ঘটেছে মাত্র। ট্রেন হঠাৎ না এলে তাদের মধ্যে কোন চিত্তবৈকল্য ঘটতো না। সময়ের অনুসঙ্গে যা প্রাপ্ত হয়েছে তাকে ফিরায়নি সে। বরং তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে গ্রহণকে মধুময় করবার চেষ্টা করেছে; তাতে কি ত্রুটি হয়ে গেল সে নিজেও বুঝে নি। সে তো দয়াবতীকে জোর করেনি কিংবা দয়াবতীও কোন জোর ফলায় নি তার উপর। নিরপেক্ষ নজরে ওরা পরস্পর কেউ কারো অভিযোগকারী নয়, তাহলে এই ভাঁড়ামী হবে কেন?

নিধিনাথের এই সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। সত্যকে স্বীকার করতেও দ্বিধা নেই। দুই প্রাপ্তমনস্ক মানুষ অতি বাস্তব প্রয়োজনে মিলিত হলে দোষ কোথায়। এখানে অবৈধ-বৈধ সীমারেখা বড় ক্লান্তিকর। এসব সে মানবে না।

নিধিনাথ বললো, 'সভাপতি বাবু আপনি আমাকে হেনস্তা করছেন ভীষণ বেআইনী ভাবে। আপনি আমাকে মারতে পারেন? কাল যদি আমাকে বাজে অবস্থায় দেখেছিলেন তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী পরীক্ষা করলেন না কেন? আমাকে শাস্তি দিলে আইন দেবে।'

যেন আগুনে ঘি পড়ে গেল। 'শালা চোরের মায়ের বড় গলা' নানা কটূক্তিতে কান পাতা কঠিন হলো। মহিলা সংগঠনের যারা ছিলো তারাও মুখ নীচু করলো। কমবয়েসী দু'চারজন তেড়ে এলো নিধিনাথের দিকে। দয়াবতীকে লক্ষ্য করে বললে, 'চল বউ এখনি তোকে পরীক্ষা করব।' একজন তো বলেই ফেললে 'ধর নে, ওর সঙ্গে সহবাস করে মেডিক্যাল পরীক্ষা করিয়ে নিধিনাথের বিরুদ্ধে কেশ দুব। শালা ইয়ার্কি পেয়েছে।' এই গণ্ডগোলের তালে যার যা গায়ের ঝাল মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করলো লোকেরা।

কেউ বলল অমুক মারানির বেটা সেবারে ভোট নিয়ে প্রচণ্ড গণ্ডগোল করেছিল। কার সঙ্গে জমির আল নিয়ে গণ্ডগোল, কারো সঙ্গে হয়তো সীমানা নিয়ে, জমিবন্ধক নিয়ে, টাকা ধার করা নিয়ে, চাল ধার দেয়নি বলে কতরকমের ফালতু গণ্ডগোলের গ্রাজ পড়লো তার উপর।

নিধিনাথ ভাবলো ওরা যা করছে করুক। আমার মেনে নেওয়াই দরকার। তাই বললো আপনারা যা ঠিক করে দেবেন তাই মেনে নেবো। সে চাপে নত হয়ে বললো, 'আমার ভুল একটা হয়েছে তা স্বীকার করি।'

বিনয় মাষ্টার বলল মহাতৃপ্তির সঙ্গে সে 'অত ঘুঘু নয় যে অহেতুক লোককে অপছন্দ করবে।' সে তার জামার কলারটা একটু ঝাঁকিয়ে নিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বললো, 'বন্ধুরা এটা তো পার্টির সভা নয়। এটা গ্রামবাসীদের সভা। আপনাদেরকে এর হিসেব বুঝে নিতে হবে। আমি বা আমরা এর বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারবো না, তবে যেহেতু নিধিনাথবাবু স্বীকার করে নিয়েছেন তাই আপাতত কিছু আমরা বলছি না। এবার দয়াবতী বৌদিকে প্রশ্ন করা হোক। উনি কি বলেন।' খানিক থেমে আবার গলা ঝেড়ে বললে 'তবে কেউ তো স্বেচ্ছায় কিছু বলবে না, তাই জোর করেও কখনো কখনো দাবী আদায় করতে হয়।' টিপ্পনী কেটে বললো, 'স্বাভাবিক নিয়মে না হলে, সিজার করলেও করতে হতেপারে। তবে বলব দোষী হলে ছাড়ব না, পাঁচচুলো করে ছাড়ব।' লোকেরা বললো, 'চালাও গুরু আমার তোমার সঙ্গে আছি।'

দয়াবতীর চেয়ে বেশ বছর কতকের বড় বিনয় মাষ্টার। বিনয় মাষ্টার তেজপুর প্রাইমারী ইস্কুলের শিক্ষক। কাজ কেবল পরচর্চা করা। পড়ানোর জন্য তাকে বিন্দুমাত্র সময় অপচয় করতে হয় না। নিজে পাক্কা পাঁচবার পরীক্ষা দিয়ে তবেই সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তার বর্ধিষ্ণু বাবা বলেছিল, 'আমার বেটা বলে পাশ করেছে, অন্য কেউ হলে পাশ করতে পারতো নি।' সে বলতো, 'ম্যাট্রিক পাশ করা কি চাট্টিখানি কথা।'

তখন অবশ্য এত ছেলেমেয়ে পড়াশোনাই করত না. যারা পড়াশোনা করত তারা যেন ভিন্ন প্রজাতির মানুষ।

ঘটনার স্রোত দেখে দয়াবতী নিজেকে অসহায় মনে করলেও মনে মনে কিন্তু কাউকেই সে বুঝতে দিল না যে কি ভাবছে। কানাই মণ্ডলের খানিকটা পাশে বসিয়েছিল তাকে। দয়াবতী আজ অবগুণ্ঠিতা। এতখানি ঘোমটা এর আগে সে কখনো দেয়নি। কেনই বা দেবে। আজ যখন ভীষণ লজ্জা দিচ্ছিলো সবাই, সে তখন একটু বেশীই লজ্জা পাচ্ছিল।

দয়াবতীর গত রাতের ঘটনাকে দোষের বলে সে মনে করছে না। তারও তো কোন পরিকল্পনা ছিল না যে খুড়শ্বশুরের সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে। সে ভাবছিলো 'একেই বলে গ্রহ' একবার এক গণৎকার বলেছিল 'সাবধানে থাকবি মা লোকে তোকে বিপদে ফেলার জন্যে তোর সঙ্গে হাসাহাসি করবে। মনে রাখবি যারাই তোর সঙ্গে হাসে মজা করে, তারাই শত্রু।' বার বার সে কথা মনে হচ্ছিল।

বিনয় মাষ্টারের সতীপনা দেখে দয়াবতীর রাগ হচ্ছিল তার ভীষণ। মনে মনে বললো, সতীরে। আমাকে যখন হেনস্থাই হতে হচ্ছে, তখন আমার একদিন কি তোমার একদিন।'

কানাই মণ্ডল বিনয় মাষ্টারকে বললো, 'বিনয়, তুমি জিগ্যেস করো দয়াবতীকে।'

মনে মনে দয়াবতী সিঁটিয়ে গেলেও সে যেন মরিয়া হয়ে গেল, সে আজ নিজেকে কোন গোপন করবে না। তাপ বাড়লে যেমন ছেলেরা গা থেকে কাপড় খুলে নেয় ঠিক তেমন করেই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত দয়াবতী বিনয় মাষ্টারের জন্যে সতর্ক হয়ে গেল। বিনয় মাষ্টার বললো, 'দয়াবতী বৌদির উদ্দেশ্যে বলছি. তুমি বলো কাল রাতে নিধিনাথের সঙ্গে ঠিক কি ঘটেছিল?'

গ্রামবাসীরা যেন দেবীবাক্য শোনার জন্য মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশ্চুপ হয়ে গেল। রূপবতী কন্যার মতো যুবতী দয়াবতী একটু অবগুণ্ঠন খুলে নিয়ে দাঁড়ালো। কিছু বলবার আগেই সভাপতি বললেন, 'না মা তুমি বসেই বলো, দাঁড়াতে হবে না, যা সত্যি তাই বলো।'

বসে পড়লো দয়াবতী। তারপর ধীর গলায় বিনয় মাষ্টারের উদ্দেশ্যে বললো, 'তোমার সঙ্গেও ফাগুন মাসে যা ঘটেছিল, কাল রাতে কাকাবাবুর সঙ্গেও তাই ঘটেছে।'

কানাইবাবু বললেন, 'কি বলছো তুমি মা?' অস্বস্তি বোধ করল বিনয় মাষ্টার। শ্রোতাদের মধ্যে একটা চাপা কৌতূহল চাঙ্গা হয়ে উঠলো। কেউ কোন মন্তব্য করল না।

দয়াবতী বললো "গেল ফাগুন মাসে কলাই উবড়ানোর জন্য দিন তিনেক বিনয় মাষ্টারের কাজে লেগেছিলুম। বিনয় মাষ্টার বলেছিল "দিনকতক কাজ করে দে।" অন্যদের সঙ্গে আমিও কাজ করছি। জমিতে কলাই উবড়ানো. কলাই জেড়ো করা.

খামারে গোছগাছ করে দেবার জন্যে বিনয় মাষ্টার আমাকে মজুরীও দিয়েছিল। তিনদিন আমি ওর কাজ করেছি। তিন দিনের প্রত্যেকদিন সন্ধ্যার আগেই যখন সবার সঙ্গে চলে যাব তখন বিনয় মাষ্টার বলত একটু থেকে লেগে পেতে সাহায্য কর। উনি থাকত। আমি থাকতুম ওর শ্রী থানে নি।' দয়াবতী 'স্ত্রী' উচ্চারণ করতে পারেনি। 'স্ত্রী'কে শ্রী বলে। বলেই চুপ করে গেল।

বিনয় মাষ্টারের ভীষণ বিরক্ত হয়ে চীৎকার করে বললো, 'হারামজাদি, খানকী মেয়ে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে। থাবড়িয়ে তোমার মুখ ভেঙ্গে দুব। এসব ষড়যন্ত্র হচ্ছে আমার বিরুদ্ধে।'

গ্রামবাসীদের কেউ কেউ বিনয় মাষ্টারের উপর বিরক্ত হয়ে বলল 'আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? ওকে বলতে দিন।' এই লোককেই সমর্থন করল যেন লোকজন।

কানাইবাবু বললেন, 'বলো তারপর।'

বিনয় মাষ্টার বললেন, 'কী হচ্ছেটা কি সভাপতি বাবু। ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে যে। গত রাতের ঘটনা বলবে তো গত ফাগুনের গল্প বলছে কেন?'

কানাইবাবু বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন গত রাতের মতো গত ফাগুনেও কি ঘটেছে সেটা বলছে, তা শোনার দরকার আছে বৈ কি। আমরা কে কি তা-ও তো জানার দরকার আছে।' হতাশ হোল বিনয় মাষ্টার।

দয়াবতী যেন সাহস পেলো। বিনয় মাস্টারকে উদ্দেশ্য করে বললো 'তুমি বলনি আমাকে। আমার সঙ্গে ঘটনা ঘটেনি।' লোকেরা বললো 'বাঃ বাঃ নগর বধূরে।' তারা বিনয়বাবুর অবস্থা লক্ষ্য করে কেউ কেউ বললে 'বিনয়বাবু ছিঃ ছিঃ আপনি কিছু বলুন' বিনয়বাবু বলবার চেষ্টা করতেই দয়াবতী বললো 'তখনো রাত হয়নি শাঁখ বেজেছিল ঘরগুলোয়, তারপর সেই কলাই-গাদার উপর আমাকে ঠেলে দিল বিনয় মাষ্টার। আমার শাঁখা গেল ভেঙ্গে। বললুম শাঁখা ভেঙ্গে গেল যে। 'বিনয়মাষ্টার বললো, 'আমি শাখা কিনে দেবো।' শাঁখা কিনে দিয়েছিলো। যাদের সঙ্গে কাজ করেছিলুম তারা জানে, বিনয় মাষ্টার শাঁখা কেনার পয়সা দিয়েছিল। গাঁয়ে তো এতো মেয়ে কারো কোনদিন শাঁখা কিনে দিয়েছে বিনয় মাষ্টার, আমার কিনে দিয়েছিল। কিন্তু কেন?' বিনয় মাষ্টার কিন্তু বলবার সাহস হারালো। সে বললো 'শালা দজ্জাল হারামজাদী, দাঁড়া তোকে আমি সাইজ করবো। আসছি।' যেন পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এমন ভান দেখালো যে এখনি এসে সে প্রমাণ করে দেবে দয়াবতী মিথ্যে বলছে। এরকম ভয়েই সে সভা ত্যাগ করে চলে গেল অথচ একটু আগে এই বিনয় মাষ্টারের দাবী ছিল চুল কেটে নেবে।

সভার মধ্যে থেকে তিরস্কারের গুঞ্জন উঠলো। অনেকেই আশা করলো একটা কিছু

ঘটবে কিন্তু সেসব ঘটবার আগেই দয়াবতী কেঁদে ফেললো বললো, 'আমি খেটে খাই, অভাবী গরীব বৌ মানুষ বলেই কি আমার শাস্তি হবে'?

ঝাঁ ঝাঁ করে উঠলো সতীশ। সে চীৎকার করে পরিস্থিতি সামলে দেবার জন্যে দয়াবতীর দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে দয়াবতীকে তড়পে দেবার চেষ্টা করলো, 'লজ্জা করেনি তোমার বৌদি, ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে তুমি বাজে কথা বলো। দারুণ ষড়যন্ত্র জানো তো।'

দয়াবতী অপরাধীর মতো চুপ্ করে থাকলো। সত্যিই তো হিসেব করলে দয়াবতী যেন স্রোতে ভেসে ভেসে সব তীরে ঠেকেছে। ঠেকে ঠেকে সাগরে মেলার মতো অবস্থা যেন যে ডাকবে সে যেন 'না' হবে না। যেন 'ডাক দিয়েছো কোন সকালে।' দয়াবতীর নিজেরও লজ্জা হয়। কিন্তু সে যেন তার লজ্জা। নিজের ক্ষিদে নিজের পেটে রাখার মতন। তার দেহকে ঘিরে তার উপর যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে কাউকে সে অভিযোগ করেনি, সে তো সর্বংসহার মতো সব কিছু মেনে নিয়েছে, সে তো কারো কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করেনি, তবে তাকে কেন হেনস্তা করবে তারা একথা বুঝতে পারেনি দয়াবতী। যাদের সঙ্গে তার নাতির সম্পর্ক, ভাইয়ের সম্পর্ক, বোনের সম্পর্ক, বন্ধু-কাকা-জ্যাঠার সম্পর্ক তারা কেন আজ তার সঙ্গে এরকম কঠিন আচরণ করছে বুঝতে পারে না। যে মানব প্রবৃত্তির ক্রুরতা হিংস্রতা সম্পর্কে কোন অভিযোগ দায়ের করতে অনাগ্রহী হয় যেন সে। তবুও আজ তাকেই মুখোমুখী হতে হচ্ছে দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে।

এরা কেউ তাকে বিনা পরিশ্রমে তার সংসার চালাতে সাহায্য করেনি, বরং তাকে চুষে নেবার চেষ্টা করেছে, তবুও দয়াবতী যেন তাদের উপাদেয় খাদ্য হয়ে আছে।

বিনয় মাষ্টারের প্রস্থান এবং তার হেনস্তা দেখে সতীশ মাষ্টার খেপে গেল। সে রাগে গর গর করতে করতে বললে, 'মাষ্টারকে হেনস্তা করা সহ্য করবনি। মাষ্টাররা সমাজের মেরুদণ্ড হতে পারে সে আমার কলিগ্ নয় কিন্তু মাষ্টারী পেশাকে যারা ছোট করতে আসবে তাদের কপালে দূর্গতি আছে বুঝে নিতে হবে।'

কানাই মণ্ডল বললেন, 'এরকম বলছো কেন সতীশ। মাষ্টার অপমান হলে ধরা রসাতলে যাবে আর অন্য কেউ অপমান হলে হতেই পারে এরকম বলছো কেন। যিনি অপরাধ করবেন সেই অপরাধীর অপরাধকে চিহ্নিত করতে হবে। অপরাধ মুক্ত হওয়াই কাজ, অপরাধী লক্ষ্য না হওয়াই উচিত।'

—'আপনি নিরপেক্ষ থাকছেন না কানাইবাবু।' সভাপতিকে আক্রমণ করলো সতীশ মাষ্টার।

সতীশ মাষ্টার কখনো কখনো দয়াবতীকে রিলিফের চাল, গম পাইয়ে দিয়েছে। তার

সঙ্গে সম্পর্কও যথেষ্ট ভাল। তার উপর ভিত্তি করেই সে যেন মরিয়া হয়ে বলে উঠলো। 'কোথাকার কে হাড় হাভাতে মেয়ে যাকে প্রায়ই সাহায্য করতে হয় যে আমাদের সাহায্য ছাড়া বাঁচে না, সে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে কেন এটা ভাবা দরকার।'

ভীড়ের মধ্যে কে একজন বলে উঠলো, 'কেন্দ্রের ষড়যন্ত্র'। সতীশ মাষ্টার আরো জ্বলে উঠলো। 'এটা কি রাজনীতি হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের প্রশ্ন আসবেই বা কেন? কে বললি রে।'

কানাইবাবু বললেন 'মাথা ঠাণ্ডা করো সতীশ। দয়াবতী কি বলছে বলুক। বলো মা কি বলছো?'

—'কি বলবো জেঠু। সতীশ ঠাকুরপো যেভাবে রেগেছে তাতে বলবার সাহস আছে?'

একজন দাবী করলো 'বলো কি বলছো। লজ্জা পাচ্ছে না মুখ বাড়িয়ে কথা বলতে?'

দয়াবতী বড় নম্র স্বরে বললো, 'তোমরা আমাকে তো দোষ দিচ্ছ। আমাকে মারো মেরে ফেলো। মেরে ফেলার আগে একটিবার তোমরা সতীশ ঠাকুরপোর কব্জিটা পরীক্ষা করে নাও। ওকে জিগ্যেস করো ওর হাতে সিঁদুরের দাগ কেন?'

সিঁদুর বলতেই সবাই যেন বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে গেল। নিধিনাথের শাস্তি দিবে কি, এখনই তো সতীশ মাষ্টারকে জুতো পেটা করা উচিত। সবার মধ্যে রে রে শব্দ উঠলো। 'ঠিক আছে সতীশ মাষ্টারের হাত পরীক্ষা করো তাহলেই সতীশ প্রমাণ হবে।'

সতীশ মাষ্টারের বেলুন যেন এক লহমায় চুপসে গেল। তবু সে বললে 'কেন রে খানকী মাগী তোর কথায় পরীক্ষা দিতে হবে?'

দয়াবতী একটি কথা বলল না।

রানু মিশ্র বললে, 'ওকে গাল দিয়ে তুমিই ছোট হচ্ছো সতীশ, তুমি চুপ করো।' রানু মিশ্র যেন ঘামতে লাগলো।

কানাই মণ্ডল বললো, 'এতে রাগারাগির কি আছে কার কথা কত ঠিক সেটা তো এখনই প্রমাণ হবে। সতীশের হাতটা দেখো তো।'

দয়াবতীর উদ্দেশ্যে জিগ্যেস করলো জনতা 'কোন হাতের কব্জিতে সিঁদুর বলছো?'

দয়াবতী বললো 'ডান হাত।'

সতীশের নিজের দেখার সাহস হল না। সে বলবার চেষ্টা করল 'এরকম বাজে অভিযোগ নিয়ে তোমরাই বা দেখতে চাইছ কেন?' কিন্তু সমবায় সমিতির সম্পাদক রবিবাবু বললেন 'দেখি সতীশ' সতীশের ডান হাতটা টেনে কব্জির নীচের দিকের সিঁদুর দেখতে পেয়ে তিরস্কারের সুরে বললো 'কী ব্যাপার সতীশ।'

হৈ হৈ করে হেসে উঠলো বনগ্রাম। বনগ্রামের রেল পারের মানুষ যেন আজ মধ্য রাতে জাদু দেখতে বসেছে।

সতীশ বললো, 'কি যা-তা বলছেন আপনারা ঐ মেয়েটাই সত্য হয়ে গেল। এটা সিন্দুর হবে কেন' বলেই মুছে ফেলবার চেষ্টা করতেই আপাতঃ গ্রামবাসীরা তার কান মুলে দিতে শুধু বাকী রাখল।

হতাশ সতীশ মাষ্টারের মুখখানা মড়ার কাঠের কুৎসিত কালো কালি হয়ে চুপ করে গেল।

রবিবাবুর সাহস হোল না দয়াবতীর বিরুদ্ধে কথা বলতে। সে বুঝে ফেলেছিল দয়াবতী মরিয়া। সে গরীব হোক মুখ্যু হোক সভার সেই কথাটি ধরেই সভার ভিত্তিতে নাড়া দেবার চেষ্টায় মেতে গেল। আগেই সতর্ক হয়ে বলল সভাপতি 'সভা ভেঙ্গে দিন।'

বনগ্রামের মানুষ তখন ভীষণ বিরক্ত। ক্রুদ্ধও। 'তোমরা যারা পাঁচজনের বিচার করে বেড়াও তারা যে এমনভাবে নোংরা হয়ে গেছ একথা না ভাবার তেমন দুর্লক্ষণ দেখা গেল না।'

একটা হৈ-হট্টগোলের মধ্যে চলে গেল সভার পরিস্থিতি। নিধিনাথ বা দয়াবতী নয় এখন দাবী উঠল 'আরো ভাল করে বিচার হোক। সবার শাস্তি দিতে হবে। কুনু শালাকে ছাড়া হবে না।'

দয়াবতী হঠাৎ দাঁড়িয়ে কি বলতে যেতেই হরিপদ কোথা থেকে এসে হঠাৎ একদম হঠাৎই, অতর্কিতে দয়াবতীর চুলের গোছা ধরে টেনে নিয়ে কাৎ করে এক লাথি মেরে দিল তার কোমরে। দয়াবতী 'বাঁচাও বাঁচাও' করে উঠতেই রে রে করে হুমড়ী খেয়ে পড়লো হরিপদর উপর। সেই ভীড়ের মধ্যে হরিপদ অনাবশ্যক দু'চার ঘা খেয়ে গেল। অথচ হরিপদর মার খাবার কোন কথাই ছিল না। সে যে কেন এরকম করল তা বুঝে উঠার আগেই তার চুলের মুঠি ধরে জিগ্যেস করলো। 'তোমাকে মস্তানী দেখাতে কে বলেছে' বলেই ঠ্যাস্ করে চড়িয়ে দিতেই সে বললো, 'আমি এসতুম নাকি। আমাকে তো বিনয় মাষ্টার যেয়ে হুমকী দেখাতেই চলে এলুম।' সে বললো, 'তোর মাগ যেসব কথা বলে আমাকে হেনস্তা করেছে, তোদের গ্রাম ছাড়া করে ছাড়ব। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারব।'

তার কথায় থ হয়ে গেল লোকজন। অন্যায় করবে আবার হুমকী দেখাবে। যারা কম সাহসী তারা বুঝলো ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। মানে মানে কেটে পড়াই ভাল। যারা সাহসী তার সব শুনে একটু চিন্তিত হওয়ার জন্য সাহস সঞ্চার করতে থাকলো।

নিধিনাথ রা কাটল না। এতক্ষণ পর্যন্ত যে অস্বস্তির মধ্যে ছিল এখন মনে হোল স্বস্তি ফিরে আসছে।

কানাই মণ্ডল দেখলো রানু মিশ্র নেই। রবিবাবু নেই। গণেশ নন্দী কাউকেই না বলে সরে গেছে। কেবল তারা রায় ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। দাস মোড়ল। তাকে এখন আর কেউ মানে না, তাই ঘাপটি মেরে বসে আছে সে।

কানাইবাবু বললেন, 'তাহলে মিটিং বন্ধ করে দেবো।'

দয়াবতী কানাইবাবুর পায়ে পড়ে গেল। 'আমাকে বাঁচাও কানাই জেঠু। আমি অপরাধী কিনা আমি জানি নি। আমার কাছে তোমাদের ঐ রবিবাবু, গণেশ নন্দী কতবার কতভাবে আমাকে পীড়ন করে। আমাকে একা পায়, আমাকে শাসায়, আমাকে লোভ দেখায় রাণুদিকে বলেওছি অনেকবার সে কিন্তু গা করেনি। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার স্বামী আজ মেরেছে, সে কুনু অন্যায় করেনি। সে এসবের কিছুই জানেনি। হাদা গোদা লোক কিন্তু ওরা তো হাদা গোদা নয়।' সে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল।

নিধিনাথ চুপ করে রইলো। তার মায়া হোল দয়াবতীর জন্যে। 'সে রূপ নিয়ে জন্মেছে বলেই পতঙ্গরা ধেয়ে আসে তার কাছে, সে রূপ পান করে যে সাহস পায় তাকেই আবার অপমান করে কি করে?' তার বলতে ইচ্ছে করছিল অনেককিছুই কিন্তু সে কিছু বলবার চেষ্টা করল না।

কানাই মণ্ডল প্রায় বৃদ্ধ ছুঁই ছুঁই। বৃদ্ধ সভাপতির আসন থেকে বললেন, 'তোমরা দেখলে তো? শুনলে তো? বুঝলেও তো? এখন কি করবো তোমরা বলবে?'

বনগ্রামের রেল পাড়ের কালী আটচালা যেন চীৎকার করে বলল, 'একটা বিহিত করা দরকার এসব বন্ধ করতে হবে। আপনি বলুন।'

বৃদ্ধ বললেন 'রূপ থাকলে রূপের তৃষ্ণা থাকে। তৃষ্ণা আছে বলেই ওরাও আছে। সংসারে এ ঘটনার বিরাম নেই। কিন্তু তৃষ্ণা থাকবেই। তৃষ্ণা যায় না। তৃষ্ণা থাকবে বলেই দয়াবতীকে এভাবে হেনস্তা করা মানায় না। এতো সেই সতীদাহের মতো জোর করে পোড়ানো। এটা হবে কেন? তোমরা যারা দয়াবতীকে ভালবাসো, তারাই তাকে হেনস্তা করবে এ কোন যুক্তি। এ বন্ধ হওয়া দরকার।'

চুপ্ করে শুনতে লাগলো বৃদ্ধের কথাগুলো।

তিনি বললেন 'জীবনের প্রয়োজনেই দয়াবতীকে দরকার। দয়াবতী থাকবে। কিন্তু সতীশ মাষ্টার, বিনয় মাষ্টার, রবিবাবুরা বা রাণু মিশ্ররা যে পিঠ টান দিলো তার কি হবে। তারাই তো সভা ডেকে বসেছিল, তারা চলে গিয়ে ভাবিয়ে গেল সবাইকে যে মিথ্যাচার বাড়বে। আমি মরে যাব কাল কিন্তু ভণ্ডামী বাড়তে দিও না। প্রয়োজনে আবার সভা হবে।' আপাতবৃদ্ধ কানাইবাবু যেন জীবনের কথা উচ্চারণ করলেন। তার বনগ্রামে যেন চাঁদ উঠলো, যদিও এখন আকাশে চাঁদ নেই অনেক আগেই সে অন্ধকার দিয়ে

ঢেকে দিয়েছে। সদলে নক্ষত্ররা দারুণ উজ্জ্বল হয়ে যেন বনগ্রামের সভা শোনার জন্য মাথা বরাবর এসে হাজির হয়েছে। হাজির হয়েছে সপ্তর্ষির মতো একটা গভীর জিজ্ঞাসা।

নিধিনাথ জিগ্যেস করলো, 'আমি কি করবো?'

কানাইবাবু কিছুছু বললেন না। দয়াবতীর দিকে তাকিয়ে কানাইবাবু বললেন, 'রাত হয়েছে যাও, আজ সব ঘর যাও।' সভাপতি সভা ভেঙ্গে দিলেন।

নানা মুখের নানা মন্তব্যে লাল হয়ে ফিরে যেতে থাকলো লোকজন। লোকশূন্য সভাস্থলে দাঁড়িয়ে রইলেন বৃদ্ধ কানাইবাবু। দয়াবতী এবং নিধিনাথ তাকে প্রণাম করলো। তিনি যেন নিশ্চল পাথরের মতো প্রসন্ন ও শান্ত। যারা মুখর ছিল তারা সবাই তখন অন্ধকারের ভিতর চলে গেল। তাদের গুঞ্জনও কানের কাছাকাছি এসে পৌছালো না।

দয়াবতী মাথা নীচু করে বললো, 'আমার কি মরা উচিত?'

নিধিনাথ বললো, 'না, মরবে কেন। আমি বাঁচব বলেই তুমি মরবে না।'

খানিক দূরে অন্ধকারের আড়ালে ছিল হরিপদ। কথাটা তার কানে গেল, অথচ কানাইবাবু কিংবা নিধিনাথকে কিছুই বললো না। কেবলমাত্র গভীর মমতায় দয়াবতীর হাত দু'টো ধরে বললো, 'চল্ দয়া, রাত হয়েছে ঘরে চল্।'